: চতুর্থ অধ্যায় :
জীবনানন্দের ছোট গল্পে ঋতু প্রসঙ্গ

কথাশিল্পী জীবনানন্দ বেশিরভাগ গল্পের কাহিনীতে আত্মজীবনীকেই গ্রহণ করেছেন। আত্মজীবনের যেসব ঘটনা ছায়া ফেলে গেছে তাঁর গল্প কাহিনীতে , সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — 'কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়', 'উপেক্ষার শীত', 'মেয়েমানুষের ঘ্রাণে', 'মাংসের ক্লান্তি', 'বিবাহিত জীবন', 'আকাঙ্খা কামনার বিলাস', 'নকলের খেলায়', 'মা হবার কোন সাধ', 'মহিষের শিং', 'আর্টের অত্যাচার' ইত্যাদি। 'সোমনাথ ও শ্রীমতী' গল্পটি ১৯৪৬ এর আগষ্ট মাসে কলকাতায় এ রচনা করেছিলেন জীবনানন্দ। এক মকর সংক্রান্তির রাতে শ্রীমতীকে প্রত্যাশা করেছিল সোমনাথ। কিন্তু আজকাল মেয়েদের ও মর্যাদা আছে, তাই পুরুষকেই পিপাসা সংবরণ করতে হয়। কিন্তু শ্রীমতীর দেহসেবা করতে যে পুরুষরা আসে তাদের নিষেধ করতে পারে না সোমনাথ। কারণ অবক্ষয়ের শতাব্দীতে কিছুই ক্ষয় নয়। মকর সংক্রান্তির রাতও যেন ছিন্ন-ভিন্ন রক্তজবার, রক্তাক্ত মানুষদের ইতিহাস।

জীবনানন্দের পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের বিষয় অবলম্বনে লেখা 'কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়' নামক গল্পটি। গল্পের প্রথম বাক্যটিই এরকম — "বিনোদ নিজের জীবনের একটা গল্প লিখছে। নিজের জীবনের কথাই, নামগুলো মাত্র বদলে দিয়ে লিখতে শুরু করেছে সে।"[১] আলোচ্য গল্পে নায়ক হিমাংশুর বিয়ে ঠিক হয়েছে। আমন্ত্রিত পূর্ব প্রেমিকা অরুণা পত্রে যে উপেক্ষা ও অবহেলা দেখিয়েছে, সেই শেষ অপ্রেমের চিঠি যৌবনের অপচয়ের শেষে একটা শীতল সমন্বয় হিমংশুর জীবনে তৈরি করেছে। 'মাংসের ক্লান্তি' গল্পের বিষয় অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে স্বামী অমূল্যর সাংসারিক বিড়ম্বনা। প্রেম বলতে যা কিছু বোঝায় সব শরৎ অরুকে উজাড় করে দিয়েছে। হয়তো কোনো একদিন আসবে, যেদিন শরৎকে অরুর প্রয়োজন থাকবে না। তখন শরৎ অরুর উপেক্ষার শীতে ডুবে যাবে। এখানে জীবনানন্দ শীতকে গ্রহণ করেছেন এই অর্থে যে, প্রেম তামাশার নয়, বরং ভালোবাসার আবেগে নষ্ট করে দিতে পারে নিজের প্রাণকেও।

'পাতা তরঙ্গের বাজনা' গল্পটিতে শীত উপস্থিত হয়েছে অস্থির মেজাজ নিয়ে। শীত যেই এল, প্রকৃতির মধ্যে বেজে উঠলো পাতা তরঙ্গের বাজনা। আড্ডাবাজ আর্টিস্টদের কেউ কবি, কেউ শিল্পী। সুন্দরী অতসীর পাশে বসে সুকুমার নিজেকে সুন্দর অনুভব করে। বছর খানেক পরে সুকুমার খবর পায় অতসীর একটি ছেলে হয়েছে। তখনই সুকুমারের মনে পড়ে কোনো একদিন বসন্তের দুপুরে ড্রেসিংরুমে তাদের চায়ের আসর। 'চাকরি নেই' গল্পে জীবনানন্দ নিজের জীবনে অবস্থাকেই বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে খুকি ও তার মা কাউকেই বেশিক্ষণ সুকুমারের ভালো লাগেনা। সে নিরিবিলি থাকতে চায়। 'হৃদয়হীন গল্প' ১৯৩২ -এর জুন মাসের রচনা। একটা টিনের আটচালা আর যৌথ পরিবার নিয়ে থাকে অমরেশ ও নীলিমা। শরতের পৃথিবী সুন্দর হলেও একঘেয়ে দৃশ্য মনে হয়। নীলিমাকে প্রত্যাশা করে অমলেশ। অমরেশের মনে হয় শরতের শিশিরে, এই তিমিরাহত রাতভরে হৃদয়হীন পরামুখ এই মেয়েটিই কেবল থাকুক তার সঙ্গী হয়ে। হেমন্তের দুপুর ও মুমূর্ষু প্রকৃতির বুকে অমূল্যের নিজেকে খাপছাড়া মনে হয়েছে। 'বিবাহ ও অবিবাহ' গল্পে কবি প্রকৃতি ও সাংসারিক মানুষের স্বভাবের পার্থক্য ফুটিয়ে তুলেছেন এই অমূল্য চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা, ২০০০ /পৃ.-১১

'অঘ্রাণের শীত' ১৯৩২ সালে ডিসেম্বর মাসে রাতের সময়কালীন লেখা। দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতা এগল্পের মূল বিষয়। হেমন্তের প্রকৃতি এ গল্পের বিশিষ্ট উপকরণ হয়ে উঠেছে। অঘ্রাণের শীতরাত জীবনানন্দের এক ভালোলাগার বিষয়। এগল্পের লেখক স্ত্রী উমার সঙ্গে বিশেষ সময় কাটায় না। তার তুলনায় মায়ের বাড়া গরম ভাত, বা তাঁকে তৃপ্ত করার জন্য বাবার কমফারটারে মাথা, কান, গলা জড়িয়ে উষ্ণতা উপভোগ করতে বেশি ভালো লাগে। এগল্পের কাহিনীর সঙ্গে জীবনানন্দের নিজের জীবনের কথার মিল রয়েছে অনেকটা। ছোটবেলার স্মৃতিকথায় জানা যায় —

> "মনে পড়ে বরিশালে শীতের সেই রাতগুলো - যখন খুব ছোট ছিলাম — প্রথম রাতেই চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে যেত। সংসারের শেষ মানুষটির খাওয়া-দাওয়া হলে তবে মা ঘরে ফিরবেন — কিন্তু যত রাতই হোকনা কেন, মা ঘরে না ফিরলে দুচোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসলেও ঘুম প্রতিরোধ করে জেগে থাকতে চাইতাম, মা ঘরে এলে তবে ঘুমোবো। খুব দেরিতে ঘরে আসতেন, চারিদিকে শীতরাত তখন নিথর নিস্তব্ধ। বাইরে পৃথিবীর অন্ধকার — অঘ্রাণ-পৌষের শীত।"[১]

এগল্পের নায়ক প্রতিম জীবনানন্দ মায়ের রান্নাঘরে গরম-গরম ভাত খাওয়ার জন্য ডাক পেয়ে খিড়কির পুকুরে মুখ ধুতে গিয়ে অন্ধকার শীত আর আকাশ ভরা নীহার স্রোত - যা দেখে তন্ময় হয়ে যান। "জীবনানন্দ তাঁর জীবনে এবং কবিতায়, কবিতায় এবং কথাসাহিত্যে এরকম 'অব্যাহত মাতৃত্বের সদাত্মাকে' চেয়ে এসেছেন, এক কামস্পর্শহীন জায়াঘ্রাণহীন আনন্দকে' মাতৃত্ব মনে করেছেন। তাঁর উপন্যাসের নায়ক মাল্যবান মাতৃহারা পরিণত মানুষ, তার অসুস্থতার শিয়রে মমতা বিমুখ স্ত্রীকে সে মায়ের অব্যক্ত ইঙ্গিত মনে করে শান্তি পেতে চেয়েছে, অনুভব করেছে তার শুশ্রূষা। এই কবিতার মতোই সিঁড়ি এবং জলধারার কল্পচিত্র-নির্ভর সেই জননী গ্রন্থির উন্মোচন। জীবনানন্দের রচনায় মা শুশ্রূষার যোগে সত্য এবং শুশ্রূষা শব্দটি দুভাবে ব্যঞ্জনাময়; এক, শোনার ইচ্ছেয় এবং দুই সেবা বা পরিচর্যায়। জীবনানন্দের পাঠক জলের মধ্যে সেবাময়ীকে খুঁজে পান, শব্দময়ীর ধ্বনি শোনেন। এ কবিতাতেও শুশ্রূষার ভূমিকা দ্বিবিধ; অনেক জলের শব্দে এক স্নিগ্ধ স্বর ধ্বনিত, আলোড়িত অনেক জলের আর - এক নিত্যকর্ম হৃদয়ের গ্লানি ক্ষয় কালিমা মোছানো।"[২] জীবনানন্দ বলেছেন — "শীত আর বীতশোক পৃথিবীর মাঝখানে আজ / দাঁড়ায়ে এজীবনের কতগুলো পরিচিত সত্ত্বশূন্য কথা —/ যেমন নারীর প্রেম, নদীর জলের বীথি, সারসের আশ্চর্য ক্রেংকার / নীলিমায়, দীনতায় যেই জ্ঞান, জ্ঞানের ভিতর থেকে যেই ভালোবাসা; ..... "[৩]

'কুড়ি বছর পরে' গল্পটি খুব আকর্ষণীয় হয়েছে পাঠকের কাছে। এগল্পটি লৌকিক থেকে অতিলৌকিকে উত্তরিত হয়েছে। রহস্যময় অতি মর্ত্যলোকের বার্তা রয়েছে এখানে। সেদিন প্রতিদিনের মতো সন্ধ্যায় তাস না খেলে চার প্রাক্তন সহপাঠী শিবরাম, নীরেন, পীতাম্বর ও অনিলের কাছে কৈশোরের দিনগুলি হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠেছিল। তারা ভাবছিল অতীত কখনোই মরে না। বাইশ বছর আগের দিনগুলো স্মৃতির মধ্যে একই আছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। আলো নিভিয়ে তারা মনে করছিল ব্রতী সহপাঠীদের কথা। অনিল অবিনাশ ঘোষালের কথা স্মরণ করলো। স্মৃতি থেকে উঠে আসা অবিনাশের মুখের উপর জ্যোৎস্নায় দেবদারু গাছের ছায়া খেলা করছিল। ঠিক বনলতা সেনের 'হাজার বছর ধরে' কবিতার মতো

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়;জীবনানন্দ দাশ:কবি ও কবিতা / ভারত বুক এজেন্সি ঃ কলিকাতা - ৬, প্রকাশ - নভেম্বর, ২০০০, পৃ. -১৯

২। বীতশোক ভট্টাচার্য ঃ জীবনানন্দ / বাণীশিল্প ঃ কলকাতা - ৯ / প্রথম প্রকাশ, ২০০১ / পৃ. - ১৫৪

৩। জীবনানন্দ দাশ;জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ (২য় খণ্ড)/বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. ঃ কলিকাতা - ৭৩ / পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ভাদ্র, ১৩৮৬ / পৃ. - ৮২

বালির উপরে জ্যোৎস্না দেবদারু ছায়া ইতস্তত বিচূর্ণ থামের মতো দ্বারকায় দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃতম্লান।

'এক-এক রকম পৃথিবী' গল্পের কাহিনীটি রহস্যময়। অতি বাস্তবতার আলো-ছায়া মাখা রূপকথার কল্প জগতই এর মূল বিষয়। রামজীবনের মনে হয় হয়তো অবিনাশের স্ত্রীও তার মতোই কোনো সর্পরাজ অজগরের জন্য হাজার হাজার বছর এই পৃথিবীর কিনারে অপেক্ষা করে আছে। আশ্চর্য কিছু নয়। মানুষের মনের ভিতর থেকেই ঝিনুক, কড়ি, কার্তিকের কুয়াশা, সাপ, মেয়েমানুষ এইসব নিরর্থক বস্তু সৃষ্টিই করেনা কেবল, যেন আত্মীয়তা সূত্রে গেঁথে দেয়। প্রেম অশান্তি বেদনা ও স্বপ্নের জন্ম দেয়। অবিনাশও একদিন দিঘির জল হয়ে যাবে ঝিনুক, কড়ি, সাপিনীর আরেক পৃথিবী থেকে কিছুতেই আর ফিরে আসতে চাইবে না। জীবন ও মৃত্যুর ধূসরতা মাখা, অচেনা-আধচেনা মুখ নিয়ে, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কাহিনী নিয়ে লেখা এ গল্পটি।

একটি অভিনব গল্প 'পৃথিবীটা শিশুদের নয়'। শিশুদের আকঙ্ক্ষা, অভিমান, ইচ্ছা, অনিচ্ছার সুন্দর কল্পকাহিনী নিয়ে লেখা এগল্প। শীতরাতে টিউশন সেরে আলের পাড় দিয়ে ফেরার সময় লোকটি কুড়িয়ে পায় এক বছর চারেকের মানব শিশু। ছেলেটির নাম রঙ্গিল। ছেলেটিকে নিয়ে লোকটির স্ত্রী ও মেয়ে আবেগে মথিত হয়। রঙ্গিল যেতে চায় না। শীতের শান্ত রাত। উত্তেজিত কোলাহল, অনেক লণ্ঠনের আলো আলোড়িত হয় অবশেষে। রঙ্গিলের বাবা, খুঁড়োরা খুঁজতে বেরিয়েছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রঙ্গিলকে বিদায় নিতে হবে। তাই লেখকের মনে হয় শিশুদের নয় 'এপৃথিবীটা আমাদেরই'।

'সোনালী আভায়' গল্পে কনে দেখা আলোয় এক সময় মানুষের মুখ রঙিন হয়ে ওঠে। আকাশে লাল মেঘ। কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় কোনো পাখি, এমনকি শালিখও নেই। ঝাপসা হয়ে গেছে অন্ধকারে। একটি বিশেষ পরিস্থিতির বর্ণনা রয়েছে এখানে। গল্পের নায়ক সতীশ মনে করে রাত কাটলে কাল সকালে অফিস মহিষের মতো শিং নেড়ে এগিয়ে আসবে। পঞ্চাশ টাকা মাইনের জন্য সারাদিন কাটিয়ে গোধূলি বেলায় আবার এই ডেক চেয়ারে এসে বসা। তার জীবন থেকে সোনালি আভা এমনই মুছে যাবে রোজ।

'সাধারণ মানুষ' গল্পটি শীত পটভূমিতে লেখা। দাদা বেরিলিতে থাকেন। অবিবাহিত, বয়স ছেচল্লিশ, ২৫০ টাকা মাইনে। শান্তিতে আছে, ব্যোমকেশ বিয়ে করেছে ছ-বছর, দ্বিতীয় সন্তান হবে এবার। কিন্তু স্ত্রী যখনই ঘুমোয়, শুধু শ্মশান আর মরার স্বপ্ন দেখে। তারপর সে ঘুমোয়। আসন্ন ভোরে ক্লান্ত জন্তুর মতো ঘুমিয়ে থাকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত। সে জাগে না। কিন্তু সেদিন ব্যোমকেশের আর ঘুম হয়না। দরজায় ধাক্কা দিয়ে কাশীনাথ জানতে চায় 'রাতে ঘুম হল না বুঝি'[১] ? কাশীনাথ যাচ্ছে কলকাতায়। আর ফিরবে না। বিয়ে করবে। কাশীনাথের কেউ নেই। চাকরি নেই। বয়স তেতাল্লিশ। কাশীনাথ ভাবে সন্তানের মা হতে পারে এমন একটি মেয়ে হলেই চলবে। সোনালী খড়ের বোঝা টেনে গরুর গাড়ি চলেছে। যুদ্ধ করতে নয়। আত্মহত্যা করতে নয়। নীড় বাঁধতে। এইসব চিরন্তন শান্তির ছবির কথা পরিবার গড়ে তোলে। শীতের পৃথিবী, নিদারুণ শূন্যতা চারদিকে, মাঠের কিনারে কাত হয়ে বসে ব্যোমকেশ ভাবছিল, কাশীনাথ যদি কমলাকে পেতো। জীবনানন্দ এখানে চির অতৃপ্তিময় মানব জীবনকে তুলে ধরতে শীত ঋতুকে গ্রহণ করেছেন। শীতের আবহে তিনি কাশীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, ''যাহা পাই, তাহা চাই না'। কিন্তু কাশীনাথ প্রকৃত শান্তির স্বরূপ ও সন্ধান সুন্দর করে দিয়ে গেছে তার বন্ধুকে।

'কুড়ি বছর পর ফিরে এসে' গল্পটিতে অন্তরের শক্তি অর্থের লালসা এবং নারী লিপ্সাকে বিতাড়িত করতে পেরেছে। সোমনাথের মনে কোনো অস্থিরতা ছিলনা। কিন্তু কুড়ি একুশ বছরের বিধবা কমলার

১। দেবেশ রায় সম্পাদিত : জীবনানন্দ সমগ্র শতবর্ষ সংস্করণ / গল্প - ২, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন, কলিকাতা - ১৩ / প্রথম প্রকাশ - ২০০২, পৃষ্ঠা - ৪৫২

মুখশ্রী সোমনাথের হৃৎপিণ্ডে দোলা লাগাল। এমনকি সোমনাথ জানতে চায় 'মৃত্যুকালে তোমার সঙ্গে হয়তো দেখা হবে একবার'। সোমনাথ ও কমলা কেউই বংশের ধারাকে অব্যাহত রাখতে পারেনি। সোমনাথ জানে সে দেশে থাকুক না থাকুক এই পৈতৃক ভিটেতে দীর্ঘ শীতরাত, পেঁচার ডাক, শিশিরের শব্দ, পূর্বপুরুষদের প্রশ্ন এগুলি চিরকাল থাকবে— কিন্তু কেন? এসব কিছুর উত্তর জানা নেই সোমনাথের কাছে। আকাশে নক্ষত্র আসে। বদ্ধ সোমনাথ মনে করে কিছুদিন শীতরাত ঠেকাতে পারবে। তারপর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিশে যাবে। গল্পটির সমাপ্তিতে অতৃপ্ত দুঃখবোধ শৈল্পিক হয়ে উঠেছে শীতঋতুর প্রভাবে।

'তাজের ছবি' গল্পটি অসাধারণ। বাবা শ্রীবিলাস ছ-বছর পরে রিটায়ার করবেন, বাড়ির ঋণশোধ কিংবা নিজের উপার্জন কোন কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করে না। চিন্তামুক্ত হয়ে ছবি আঁকে এবং ভাবে ছবি বিক্রির টাকায় সে পৈত্রিক দেনা শোধ করতে পারবে। তাজমহলের তিনটে এফেক্টগুলো বড্ড ফ্লিটিং। আগ্রায় এক সাহেবী হোটেলে উঠল বিজন। দুদিন পরেই আরো তিনশ টাকা আনিয়ে নিল বাবার কাছ থেকে। আগ্রায় ভীষণ গরম, শ্রাবণেও মেঘ নেই। খুব ভোরে সূর্যের পিঁয়াজী সোনালী রঙের তাজের গম্বুজ মিনার স্বপ্নের মতো মনে হয় তার। আর জ্যোৎস্নায় সেই তাজ আর একরকম, কিন্তু বৃষ্টির করুণ আলোয় যে তাজ, সে তাজকে সে দেখতে পাচ্ছিল না। বর্ষার তাজকে দেখার জন্য বাধ্য হয়ে তাকে দিল্লী চলে যেতে হয়। কিন্তু তখন বৃষ্টি হল না, বরং সে চলে আসার পর বৃষ্টি শুরু হল আগ্রায়। আবার সে চলে গেল আগ্রায়। দুর্ভাগ্যবশত সেখানে তখন ঝাঁ ঝাঁ রোদ। যখন বৃষ্টি আগ্রাতে হয়েছিল তখন বিজন দিল্লীতে। তারপরই আত্মকেন্দ্রিক শিল্পী বিজন উপলব্ধি করলো যে প্রকৃতি খেয়াল খুশি মতো চলে না। আবেগপ্রবণতা দিয়ে নয়, দৃঢ় সংকল্প ও সাধনার সঙ্গেই জীবনকে সঠিক পথে চালাতে হয়। প্রেমময়ী মাধবীর প্রস্তাব যে বর্ষা পটভূমিতে তাজের ছবি আঁকা — এ প্রস্তাব বিজনের পছন্দ হয়। কিন্তু কোন এক বৃষ্টি গভীর রাতে সন্ধ্যা নামক মেয়ের অনুপ্রেরণায় বিজন তন্ময় হয়ে তাজের ছবি আঁকে। দুই প্রেমময়ী নারী বিজনের জীবনে উপস্থিত হলেও কাউকেই জীবনসঙ্গিনী করতে পারলো না সে।

'বিলাস' গল্পের নায়ক শান্তিশেখরের জীবন-মৃত্যুর গল্প রয়েছে এখানে। শান্তিশেখরের নারীটি রূপহীনা। এগল্পে এই নারীটির মৃত্যু ঘটেছে। "কিন্তু সেই রাতেই নিজের বিছানায় — শীতের রাতের গভীরতার ভিতর কী করে যে তার মৃত্যু হল, ডাক্তার কোন যেন পরিষ্কার হিসেব দিতে পারলনা"[১] নারীটির এই মৃত্যু সুস্মিতাকে ছাড়া কাউকেই বিচলিত করতে পারেনা।

'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলোতে দেখা যাচ্ছে জীবনানন্দ কার্তিকের সময়ে মৃত্যুবরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। 'সমুদ্রের স্রোতের মতো' গল্পে বলেছেন মানুষের জীবন গাছের মতো। অন্ধকারে, কুয়াশায় অনেকদিন পর্যন্ত ডালপালা ছড়িয়ে, সময় কাটিয়ে তারপর মৃত্যুতে সব শেষ হয়ে যায়। জীবন স্রোতের মতো প্রবাহিত হয়ে চলে, সমুদ্রের স্রোতের মতোই অন্ধ ও অর্থহীনভাবে। কোন এক অন্ধকার মুহূর্তে মরণ এসে উপস্থিত হয়। সু-সময় অর্থাৎ পৌষের দিন একদিন শেষ হবেই। অনিবার্য মৃত্যুকে মেনে নিতে হবে সবাইকে। এ গল্পের নায়ক তথা জীবনানন্দ তাই মৃত্যুকে মেনে নিয়েই নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, "আশ্বিন বা কার্তিকের নরম রোদের ভেতর বসে চারদিককার সবুজ নীলাভ পৃথিবীর দিকে তাকাতে তাকাতে আমি মরবো।"[২]

বিচ্ছেদের অশ্রু লবণাক্ত দূরত্বকে প্রকাশ করতে শীত ঋতুকে গ্রহণ করেছেন জীবনানন্দ। 'বিচ্ছেদের কথা' গল্পে অঘ্রাণ মাস, শীতের অনুভূতিকে সরাতে মানুষ গরমের সংস্পর্শে থাকতে ভালোবাসে। শীতের

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা-১১০০/২১শে বইমেলা, ২০০০/পৃ.-৮৪২

২। তদেব;পৃ. - ৪১৭

সময় অঘ্রাণের প্রাকৃতির পরিবেশের অসাধারণ বর্ণনা রয়েছে। এগুলোর নায়ক স্টিমারের কোনে বসে অনুভব করে শীতের হাওয়ার ঝাপট, সবই যেন তার ভালো লাগে। মাথার ওপর আকাশের দিকে তাকিয়ে সে দেখেছে অঘ্রাণের আকাশ থম্‌থম্‌ করছে। জাহাজের রেলিঙের দিকে এগিয়ে দেখেন "অঘ্রাণের আকাশ ঘিরে কিছুক্ষণ আগে যে শ্রাবণের মতো মেঘ করেছিল সে সব মেঘের কোন আভাসও নেই। এখন আর সমস্ত আকাশ ঝড়ঝাপটা পরিষ্কার, অনেক তারা উঠেছে। নদীর ওপরের ভাঁটশ্যাওড়া করমচা ও কুলের জঙ্গলের ভেতর থেকে চাঁদ উঠেছে।"[১]

'পালিয়ে যেতে' গল্পের নায়ক বাবা-মা-নীলিমাকে ছেড়ে থেকে সুখী বোধ করে নি। মনের ভিতর চিন্তা, স্বাদ, রঙ ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে যাচ্ছে। একটা নভেলও পড়তে ইচ্ছে করেনা তার। দেশের বাড়িতে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। তার খুব করে ইচ্ছে হয় —

> "সেই মস্ত বড় সবুজ সতেজ লেবু গাছটা সেখানে আমার জানালার পাশে ডালপালা ছাড়িয়ে নিবিড় হয়ে রয়েছে, পূবদিকের আটচালার সেই ছোট্ট কোন টুকুর ভিতর খাটের উপর মাদুর ফেলে শুরু থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। নীলিমা হয়তো খাটের পাশে এসে বসবে - বেশ ভাল কথা; স্নান হয়ে গেছে স্নিগ্ধ নারকেল-তেল মাখা ঠাণ্ডা চুল; খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছে।"[২]

এ গল্পের নায়ক - মাদ্রাজ, রেঙ্গুন, কলকাতা নানা জায়গায় কাজকর্ম নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সমস্ত সকাল, দুপুর, রাত কাজকর্মের ভিতর নায়কের নিজেকে রক্তমাংসহীন পুতুল মনে হয়। প্রকৃতির স্নিগ্ধতার স্পর্শে শুধুমাত্র আবার জীবনের প্রতি আগ্রহ ও আস্বাদ জেগে ওঠে। প্রাণের তৃপ্তির পক্ষে শুধু প্রকৃতির নীলিমাই যথেষ্ট। এমনকি মাকেও নয়। "এই সমস্ত ঘর-দোর যদি প্রাণহীন হয়ে পড়ে থাকে তা হলেও দেশের বাড়ির এই মাঠ-প্রান্তরের আস্বাদ, জোনাকি-জ্বালা সন্ধ্যা, ভুতুম পেঁচার ডাকে-ভরা রহস্যময় রাত, পথপ্রান্ত, মানব-আত্মাকে অনেকদিন পর্যন্ত নিবিষ্ট করে রাখতে পারে।"[৩]

'রক্তমাংসহীন' গল্পের ঊষা স্বামীর কাছে থাকতে চায়। অনেক বার যাই যাই করেও বাপের বাড়ি যেতে চায় না সে। একরকম জোর করে, বাপের বাড়ি শেষপর্যন্ত যায় ঊষা। এদের দাম্পত্য অসুখী জীবনকে তুলে ধরতে শীত ঋতুর ব্যবহার করেছেন গল্পকার।

একসময় কুড়িপঁচিশ জন লোকের ভিড়ে থাকতো, এখন মেজোকাকা ও পিসিমার সঙ্গে থাকে শুধু। মা দেশ ছেড়ে চলে গেছেন কলকাতায় বোনের অসুখের জন্য। স্ত্রী শোভনা ও খুকিও চলে গেছে। বাবার অসুখের খবর দিয়ে স্ত্রী একবছর বাবার বাড়িতে থাকার জন্য চিঠি লেখে। মনটা কেমন যেন করে ওঠে তার। বাড়ির উঠানটা মাঠের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। সেই উঠানে ঘুরে বেড়ায় গল্পের নায়ক। জামরুল, কৃষ্ণচূড়া নানাগাছ, শালিখ, টুনটুনি, মাছরাঙা ইত্যাদি পাখির খেলা দেখে। চাকরির বহু চেষ্টা করেও হয়নি। জানলার পাশে ফাল্গুনের দুপুর বেলায় অবাক হয়ে বসে ভাবে কলকাতায় যাবে। কোকিলটা দেখে তার

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা -১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.-৪২০

২। তদেব ;পৃ. - ৪৫৮

৩। তদেব ;পৃ. ৪৫৯

ছেলেবেলাকার রূপকথার গল্পগুলি মনে পড়ে। জীবনটা স্মৃতি হয়ে উঠতে চায়।

> "রূপকথার একরাজ্য, রূপসী ও পরীর স্বপ্ন দেখি, তারপর মানুষের সংসারের প্রেমও উপেক্ষার অনেক ঘটনা বাতাসে ভাসতে থাকে;ঊষার কথা মনে পড়ে, রাণীর কথা, নির্মলার কথা। এরা সকলেই ছিল খুব সুন্দরী অভিমানিনী, বেশ প্রখর বুদ্ধি মতী, কেমন অপ্রসন্ন হৃদয়হীন ....(?) অনুভবময় কঠিন নারী। কিন্তু তবুও এরা ছিল বলেই প্রেমহীন বিচ্ছেদহীন সৌন্দর্যের মূল্যবোধহীন জীবনের চিরসত্য আমাকে ঠকাতে পারল না। এরা কে কোথায় চলে গেছে জানিনা; কিন্তু এদের কথা মনে হলেই চারদিককার শাদা সাধারণ শুষ্ক বৈধতার হাত থেকে অনেকখানি মুক্তি পাওয়া যায়; হৃদয়ের রঙ আশ্বিনের ঘাসের মত হয়ে ওঠে"[১]

অর্থাৎ বিবাহিত নায়কের জীবন ছিল প্রেমে অতৃপ্ত। তাই সে অতীতের প্রেয়সীদেরকে হৃদয়ে অনুভব করেছেন। শরতের ঘাস যেমন সবচেয়ে বেশি সুন্দর ও সবুজ, তেমনি অতীতের প্রেয়সীদের প্রেম তার জীবনে ছিল কাম্য ও আকাঙ্ক্ষিত। সেসব নারীদের না পেয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে হৃদয়ে অনুভব করতে চেয়েছেন। সবুজ পল্লবিত জারুলের ঐশ্বর্য, মেহেদি পাতার বনে স্বপ্নাতুর ঝিঁঝি, ছাতিমের ডালাপালায় গাঙশালিকের জীবনোচ্ছ্বাস, কৃষ্ণচূড়ার অজস্র কুঁড়ি, চারিদিকের প্রাচুর্য্য, সফলতার মধ্যে নায়কের জীবন কোলাহল মুখর হয়ে উঠেছে।

'লোভ' গল্পে বেকার যুবকের দুঃখময় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষা, যোগ্যতা থাকলেও যুবকটির কপালে কোন স্থায়ী চাকরি জোটেনা। প্রবাহিত জীবনের স্রোতে সে বড়ই প্রবঞ্চিত। জীবনানন্দের আত্মজীবনের কাহিনীকে পবিেশন করেছেন নৃপেন চরিত্রের মধ্যে। নৃপেনকে বাড়ির বউঝিরাও পর্যন্ত অবহেলা করে শুধু মা ছাড়া। যে দুপুরে পুরুষ মানুষেরা টাকা রোজগারের বিরস কর্তব্যে জীবনে সুন্দর দিকটাকে অলস হৃদয়ে বিলাসের মরীচিকা বলে উপেক্ষা করেছে, তাদের বধূদের কাছ থেকে সরে যায়। নৃপেন এক বেকার যুবক। সংসারের সকল মেয়েমানুষদেরও শেষে খায়। পান পর্যন্ত একটা আশা করতে পারেনা। ব্যথিত, মর্মাহত হয়ে থাকে নৃপেন সবসময়ের জন্য। রক্তমাংসের আনন্দ, উদরের পূর্তি-কোন কিছুর প্রতি তার লোভ নেই। বইয়ের প্রতি প্রীতি, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে সে কুণ্ঠাবোধ করে। সুচারু নৃপেনের জীবনকে ব্যঙ্গ করে বলে— "তা দেখো নারীকে বাদ দিয়ে জীবনটা যেন কাটিও না নৃপেনদা।"[২] নৃপেনের কোন বিষয়ের প্রতি লোভ নেই। সে একান্তে প্রকৃতির ভালোবাসাকে নিজের করে নেয়। নৃপেনের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসঙ্গে গল্পকার জীবনানন্দ বলেছেন —

> "নৃপেন নারকোল গাছের সবুজ উজ্জ্বল পরিষ্কার পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে বৈশাখের নীল আকাশের মুখোমুখি দু-এক মুহূর্তে চুপচাপ বসে থেকে বললে — 'বাঃ ভারী সুন্দর দিনটা'। নৃপেনের এই অনুভূতিকে কেউ প্রতিসহানুভূতি করতে গেলনা। বলে ফেলে নিজেও নৃপেন কেমন সংকোচ ও কুণ্ঠাবোধ করতে লাগল।"[৩]

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.৪৭৮

২। তদেব;পৃ. - ৫০৫

৩। তদেব;পৃ. - ৫০১

নৃপেন ভিখিরিদের দিকে, নিজের জীবনের দিকে তাকিয়ে ভেবেছে মানুষের হৃদয় অত্যন্ত বিশুষ্ক ও বিমুখ হলেও পৃথিবীটা বড় ক্ষমাময় ও খুব সুন্দর। 'বৈশাখের নির্মল দুপুরটা - বা কি সুশ্রী'[১]। দুপুরের গরমে বাতাসের ভিতরেও কি সুন্দর একটা গুঞ্জন রয়েছে। নৃপেনের কাছে জগৎ বড় সুন্দর অপার্থিব।

'কল্প জিনিসের জন্ম ও যৌবন' গল্পে গ্রীষ্ম ঋতুর সমাবেশ ঘটেছে। বিড়ম্বনা ও বেদনার প্রতীক হয়ে উঠেছে এ ঋতু। তবে গল্পকার বলেছেন, "বেশ বোশেখের দুপুরটা ছিল - চারদিকে ঝাঁ ঝাঁ রোদ যেন"[২]। গ্রীষ্মের খরতাপ, রুক্ষ্ম রূপ, অগ্নিস্রাবী চেহারা আকাশ বাতাস ও মৃত্তিকাকে দগ্ধ করে। তবুও গ্রীষ্মে কালবৈশাখীর বর্ষণে শুষ্ক শতদীর্ণ মৃত্তিকা সরস হয়। গল্পকার জীবনানন্দ 'প্যাঁচা ও জোনাকিদের মধ্যে' গল্পে দেখিয়েছেন নায়ক ধীরে ধীরে সর্বহারা, সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ছে। বাবার মৃত্যুর পর সংসারের মূল্যবান জিনিস একে একে সব বিক্রি হচ্ছে, ঋণ হয়ে যাচ্ছে অনেকটা, মা, বোন এরা দেশের বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। নিজে একটা চল্লিশ টাকার স্কুলমাস্টারি করে। স্ত্রীও মারা গেছে। নায়কের এমনই নিঃসঙ্গ অবস্থাকে লেখক গ্রীষ্ম ঋতুর অনুষঙ্গে প্রকাশ করেছেন, —

> "কখনো-বা ছাদের উপর শুয়ে থাকি। কখনো কাকার পুরোনো মুহুরির ঘরে একতলার বাঁ-দিকের কোঠাটায়, কখনো যে ঘরে আমার স্ত্রী মারা যায় সেইখানে, সেই পুরোনো পালঙ্কটার উপর যতক্ষণ খুশি রাত জেগে কাটিয়ে দেই। বাতাবি ফুলের গন্ধ আসে। এক-একদিন হয়তো ঝাড়বাতিটা জ্বলে, পুরোনো চিঠিগুলো পড়ি। কখন আকাশে মেঘ করে আসে। মেঘ ভেসে যায়। চাঁদ গড়িয়ে পড়ে। বৈশাখের রাত হু-হু করতে থাকে।"[৩]

'প্রণয়হীন' গল্পেও গ্রীষ্মের পটভূমি অঙ্কন করেছেন। গল্পের প্রথমের দিকে সুধাংশু জীবনকে উপলব্ধি করতে গিয়ে বুঝেছে যে, - "কোনো কিছুরই স্থিরতা নেই। কল্পনাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় শুধু। আর জীবনের রহস্যবোধটাকে। বৈশাখ মাসের দিন, তবুও আকাশ খুব মেঘলা। ঝির্ ঝির্ করে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। হাওয়া ছাড়তে না ছাড়তেই বেশ বৃষ্টি শুরু হল। বৃষ্টি ক্রমে ক্রমে কমে গেল অবিশ্যি, কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাসের আমেজটা রয়ে গেল।"[৪] সুধাংশুর প্রেমহীন জীবনের শুষ্করূপ তুলে ধরতে বৈশাখের আবহ নির্মান করেছেন। রোদ, প্রান্তর ধূ-ধূ করছে। সবুজ ঘাস নেই, ছায়া নেই, শুধু পাথরের চাঙড়, বৈশাখের প্রকৃতি মাঠ-পৃথিবী সমস্ত যেন এক কঠিন যজ্ঞের জন্য উপযুক্ত গেরুয়া মাংসের স্তূপ বের করে বসে আছে। নির্মলা নামের যে মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় তৈরি হয়েছে সে সুধাংশুর লেখা গল্প-কবিতা-উপন্যাসের প্রতি কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না। নারীর সামান্য সঙ্গের ফলে সুধাংশুর মনে যে বৃষ্টি ভেজা আর্দ্র পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তা নিমেষেই শুকিয়ে যায়। গল্পকার জীবনানন্দ এই পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছেন অদ্ভুত কাহিনীর দ্বারা, —

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.৫০৩

২। তদেব;পৃ. - ৫১৬

৩। তদেব;পৃ. - ৫৫১

৪। তদেব;পৃ. - ৫৬১

"—আঃ, বাদলা করে কি মিষ্টি ঠাণ্ডাটাই না পড়েছিল। আর এখন, এখন যেন লুয়ের মতো গরম একেবারে।' চারদিকে তাকিয়ে সুধাংশু - 'একটা কথা ভেবে আমি সমস্ত সকালটা অবাক হয়ে আছি' —

—'কী বলুন তো?'

— 'বিছানার পাশে জানালাটা খুলেই তো শুয়েছিলাম, কিন্তু এতবড় বৃষ্টিতেও বিছানা ভিজল না। মুখে চোখে একফোঁটা জলও পড়লনা। এ কী রকম?'

—হয়তো ভিজে ছিল, ঘুমের ভিতরেই শুকিয়ে গেছে আবার"[১]

'আকাঙ্ক্ষার জগৎ' - এ গল্পে উপমা ও বিভূতির বিবাহিত প্রেম - অপ্রেমের বর্ণনা রয়েছে। বিভূতি বই নিয়ে সময় কাটায়। একটি শিশু আসার পর বিভূতি বিছানা আলাদা করে নিয়েছে। এই খুকিকে অজুহাত করে বিভূতি লাফিয়ে বলে ওঠে "দিব্যি চমৎকার চোত-ফাগুনের রাত, আমি তো বাইরে গিয়ে উঠানেও শুতে পারি।"[২] উপমা চুপ থাকে তারপর বলে, খুকিকে নিয়ে সে একা পেরে উঠবে না। সংসারের দিকে তাকালেই বিভূতির হৃদয় একরকম বিমুখ হয়ে ওঠে। তার মনে হয় প্রেম সংসারে উপহাসের জিনিস হয়ে উঠেছে। বিভূতি কোন উপার্জন করতে পারে না। সংসার সংগ্রামটা দাদারা কোনরকমে চালিয়ে দেয়, কিন্তু ভিতরের সংগ্রামে সে ব্যথা অনুভব করে। খাওয়া-দাওার পর তাস খেলে এক শিশুর মতো ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। পৃথিবীর কোন ব্যথা, বিড়ম্বনা তার উপর নির্ভর করে নেই। এ সবকিছুকে সে যেন বিধাতার উপর সমর্পণ করেছে। ঘুম আসেনা উপমার। অনেক রাত পর্যন্ত সেলাই করে, আর হাতে তৈরি সুন্দর জিনিসের দিকে তাকিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে উপমা। বিভূতির মনের ভাবনা বাস্তব জগৎ থেকে অনেক দূরে। তাই সে বলে —

"তারপর রাত্রে ছাদে গিয়ে ছায়াপথ ও তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হয় শিশুটি যেন ওইসব জায়গার থেকে এসেছে আসলে, আমাদের কদর্য রক্তমাংসের যত্নে বাস্তবিক তার কোন সম্পর্ক নেই।"[৩]

'সঙ্গ, নিঃসঙ্গ' গল্পে নায়ক এক বিরহী প্রেমিক। সে চিলের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেছে। এগল্পের নায়কের সঙ্গে 'পাখিরা' কবিতার নায়কের ভাবনার মধ্যে একই মিল দেখা যায়। স্ত্রী বাপের বাড়িতে থাকে। পুরো গল্পটাই প্রকৃতির বর্ণনায় ব্যস্ত। নিঃসঙ্গ নায়ক অনুভব করে মৃতা রূপসীর ললাটের সিন্দুর, গোধুলির মেঘ, শীত সন্ধ্যার কুয়াশা এদের সুর তার জীবনে কখনো কখনো বেজে ওঠে। নায়কের মতোই তার যোগ্য চাকরটিও। সংসার সম্পর্কে তার মন বড়ই ঢিলেঢালা। কাজের চেয়ে অবসাদেই কাটে বেশি সময়। আবার কোন পূজা-পার্বন গাঁয়ে হলে তার দেখাই পাওয়া যায় না। সে সময়টা অতিবাহিত করে এভাবে — "কিংবা মনসাতলায় নিরিবিলি অশ্বথ গাছের নীচে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া চৈত্রের দিনটা সাঙ্গ করে।"[৪] এগল্পের নায়ক যে শুধু নিঃসঙ্গ তাই নয়, তার চারপাশের পরিবেশ ধবংসের মুখে উপনীত হয়েছে। তবুও নায়ক অতীত স্মৃতিকে আঁকড়ে, অর্থাৎ গলিত চন্দন হলেও তারই আস্বাদ গ্রহণ করতে চেষ্টা করে।

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.৫৬৪

২। তদেব;পৃ. - ৫৬৮

৩। তদেব;পৃ. - ৫৭৪

৪। তদেব;পৃ. - ৫৭৬

"সূর্য আর সঞ্জীবন পাখি, রৌদ্রনীলিমা এবং নাক্ষত্রিক জ্যোতিষ্কশিখা, সর্বোপরি মৃত্তিকাব্যাপী ঋতুচর্যার গভীর স্পর্শ আছে বলে ডান ও বামের অবিশ্রাম মৃত্যুর অভিঘাত অতিক্রম ক'রে পাড়ি দিয়ে চলেছে সে অপরিমেয় জীবন — পদে পদে 'সেই' এই অনুভব কবে জয় ক'রে এবং আলো সহিষ্ণুতা ও স্থিরতার জয় ঘোষণা করে। ১৯৩৬ এর পাণ্ডুলিপিতে লিখেছিলেন : 'হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি' — কোনোদিন আর জাগব না জেনে, -'১৯৪৬ - ৪৭' কবিতাতে ও 'কেউ নেই, কিছু নেই, সূর্য ডুবে গেছে', এই অবিচলিত অসহায়তা, কিন্তু মুহূর্ত - জাগতিক অসহায়তা, প্রকৃতির অবারিত স্বাগত তারই মধ্যে নিরন্তর প্রবুদ্ধ করে তুলেছে' তাঁর আস্তিক্য, ..."[১]

ধবংসপ্রাপ্ত ছবিগুলি এরকম — ".....নোনা-ধরা দেয়াল, ইটফাটিয়া-চুরিয়া পাটকেল হইয়া খসিয়া পড়িতেছে, মেঝের ভিতর ফাটল, আগাছা সেখানে ইন্দুরও থাকে, সাপও থাকে, জীর্ণ শীর্ণ খাট ভাঙিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে দিঘির জল পচিয়া উঠে, বাড়ির চারিদিকে জঙ্গল, ভিতরের কোঠাগুলো ছেঁড়া-খোঁড়া, ফাটা-টুটা বেওয়ারিশ জিনিসের ভাঁড়ার শুধু; যেখানে সেখানে ছুঁচা ছোটাছুটি করিতে থাকে। ..... ইহাদের মাঝামাঝি আরো কত অনুভূতি দিনরাত তাহাদের ছায়ার শরীর, ছবির শরীর, রেখা ও তন্তুর উজ্জ্বলতা ও অন্ধকার লইয়া বুদ্বুদের মত স্ফুরিয়া ওঠে - মুছিয়া মিশাইয়া যায়।"[২]

প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই জীবনানন্দ একটি ভাবুক চরিত্রকে অঙ্কন করেছে যে সংসারের থেকে প্রকৃতিকেই কাছের করে নিতে ভালোবাসে। এমনকি কোন মানুষের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ও প্রকৃতির উপমাকে টেনে আনেন। 'বাইশ বছর আগের ছবি' গল্পের দ্বিজেন চরিত্রটির চিন্তা ভাবনা এরকম। কোন এক আষাঢ়ের রাতে, যখন ভ্যাপসা গরম ছিল খুব তখন দ্বিজেন চোদ্দ - বাইশ বছর আগের কথাকে স্মৃতিপটে ভাসিয়ে তুলছে এক এক করে। তার মানে পড়ে চোদ্দ বছর আগের কথা, দার্জিলিঙে ইচ্ছে করেই একটা চাকরি নেয়নি দ্বিজেন। এখানে আষাঢ়ে যে গরম তৈরি হয়েছে সেখানে থাকলে হয়তো আষাঢ়ের রাতে বেশ শীত অনুভব করতো দ্বিজেন। পাশে প্রিয়নাথকে ঘুমাতে দেখে তার মনে হল - "থোক থোক পর্বতের কুয়াশার ভিতর তৃপ্ত হয়ে পড়ে আছে যে, মিছেমিছি পৃথিবীর বেদনার ভিতর তাকে ডেকে এনে কী লাভ?"[৩]। সে অন্ধকারের ভিতর তাকিয়ে দেখে ঘরের ভিতর দু-একটা জোনাকি উড়ে এসেছে, অরণ্যের নির্জনতা, গাছের অজস্র ছায়া, নিম পলাশের ডালপালার ফাঁক দিয়ে কয়েকটা তারা সোনালি বুদবুদের মতো চাঁদ আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে দ্বিজেন দেখল পটেশ্বরী বিছানায় নেই। তারপরই দ্বিজেন ভাবতে শুরু করে —

> "পটেশ্বরী কোথায়? হয়তো পাড়ায় কোথাও গিয়েছে। কোথাও হরিসংকীর্তন শুনতে হয়তো। আষাঢ়ের এই ঘর আবিশ্যি নিস্তব্ধ - কিন্তু চারদিককার বাতাসের ভিতর রৌদ্রময়ী পৃথিবীর গন্ধ এখনো ফুরিয়ে যায়নি। সকলের মতো পটেশ্বরী দিনের আলোর মানুষ। দ্বিজেন? রৌদ্র কোলাহলের ভিতরেও তার মনের ভেতর কেমন যেন বড় বড় গাছের ছায়া খেলা করে। অনেকখানি নির্জন জল, তার পাশে নীল শান্ত বড় বড় গাছের নিস্তব্ধতা।"[৪]

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়;জীবনানন্দ দাশ:কবি ও কবিতা/ভারত বুক এজেন্সিঃকলিকাতা -৬,প্রকাশ - নভেম্বর,২০০০,পৃ.-১৭২

২। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.৫৭৭

৩। তদেব;পৃ. - ৬৮১

৪। তদেব;পৃ. - ৬৮২

তারপর দ্বিজেনের মনে পড়ল ইস্কুলের মস্তবড় দালানবাড়ি, বড়বড় বটগাছ, নিমগাছ, রৌদ্র, বাতাস, হেডমাস্টার, সাদাসাদা পুঞ্জীভূত কুয়াশা এবং বাইশ বছর আগের ছবি। যখন ছিল ১৯১৪ সাল, তখন ছিল সেই শেফালিকা। যে শেফালিকা কৃষ্ণচূড়া ধূসরতার ভিতর, বটের ছায়ায় নীলকণ্ঠের পাখিদের ওড়াওড়ির সঙ্গে মিশে থাকতো। তারপর মনে পড়ে চপলার কথা। চোখাচোখি দেখা হয়নি কোনদিন চপলার সাথে। কিন্তু তার প্রেম এসে দ্বিজেনের হৃদয়ে নাড়া দিয়েছিল। চপলার রূপ অন্ধকার ঘুমের ভেতরেও পৃথিবীকে জাগিয়ে তুলতে পারে। আবার কখনো দ্বিজেনের হৃদয় সেই শীতের রাতে উষ্ণ ফেনার মতো বার বার আবৃত হয়ে যায় অথবা সিন্ধু সারসের ডানার মতো জীবনের সমস্ত শীত ও ব্যথার ভিতর সমুদ্রের কোলাহল ও আলো জেগে ওঠে। জীবনের নীল-হলদে কামনার রাজ্যে, অপরিসীম স্বস্তির ভিতর চপলা ও দ্বিজেনের মৃতদেহ ঘিরে নক্ষত্রের কুহক তৈরি করে, আবার কখনো দ্বিজেন মনে করে —

> "নিজে দ্বিজেন বাংলার ঘাসের মতো, বিষণ্ণ ইছামতীর পারে যার জন্ম, বাংলা হেমন্তের অঘ্রাণে বাসমতী ধানের সঙ্গে সঙ্গে যে নিজেও একদিন হলুদ হয়ে যাবে - হয়ে যাবে হিম, ... যার হাত সে দেখেছে সেই চপলাকে পেতে হলে একটা ভালো (ইউনির্ভাসিটির ডিগ্রি চাই)।"[১]

দ্বিজেন অনুভব করেছে জীবনের সবচেয়ে সুন্দর জিনিস হচ্ছে নিস্তব্ধতা। প্রত্যেক মানুষই সকাল বেলার রৌদ্রে নিত্য দিনের জীবন শুরু করে।

'কুড়ি বছর পরে' গল্পটির শুরুতে রয়েছে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির কথা। নীরেন, পীতাম্বর এদের কথোকপকথনে মধ্যে বাইশ বছর আগে দেখা অবিনাশ ঘোষালের আলোচনা চলছিল। চমৎকার যুবক অবিনাশ, পুরুষের এমন সুন্দর চেহারা দেখা যায়না বললেই চলে। অন্ধকারের ভিতরেও মুখের রঙের উজ্জ্বলতা ধরা পড়ে। কুড়িবছর পর শিবরামের সঙ্গে অবিনাশের দেখা হল। এখনও অবিনাশ সেই অন্ধকারের ভিতর নিশ্চু প হয়ে বসে থাকে। অবিনাশের মুখখানিতে একটা গভীর আকর্ষণ আছে। অনেক নারী তাকে প্রেম দিতে চেয়েছে কিন্তু সেসবের সে সুব্যবহার করতে পারেনি। গল্পের শেষে, দেখা যায় একটা দেবদারু গাছের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে অবিনাশের মুখে পড়েছে। ম্লান জ্যোৎস্না এসে অবিনাশের মুখে পড়েছে। ম্লান জ্যোৎস্নার আলোয় নিঃসঙ্গ অবিনাশের মুখের রূপ ঝিনুকের মতো, হাতির দাঁতের মতো ধূসর। কুড়ি বছর আগের অবিনাশের রূপ ভেঙে গেছে, কিন্তু এখনও সে নরম অসামান্য গলায়, মিষ্টি সুরে, করুণ ভঙ্গিতে কথা বলে যায় —

> "তুমি? কী কাজ? এ পৃথিবীতে এমন কোনো কাজ থাকতে পারেনা যার জন্য অন্ধকারের ভিতরেও আলো জ্বালাতে হয়। আমি তোমাকে অনেক জিনিস বুঝিয়ে দেব। তারপর ক্রমে ক্রমে দেখতে পাবে সব। এমন শান্ত সুন্দর সংসর্গ পাবে যে কিছুতেই আর পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাইবেনা তুমি।"[২]

বৈশাখের অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা দিয়ে লেখা 'রক্তের ভিতর' গল্পখানি। লেখক জানিয়েছেন কোন কাজের লেখাই তিনি লিখতে পারছেন না। —

> "কিন্তু প্রথম দিন কিছু লিখতে পারলাম না আমি। সমস্ত সকালবেলা, বৈশাখের সমস্ত সকালবেলা জানালার কাছে কলম হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। ..... বৈশাখের কয়েকটা দিন এমনি করে কেটে গেল আমার, টেবিলের পাশে বসে, আকাশের দিকে তাকিয়ে, লিখবার চেষ্টা করে, কথা ভেবে।"[৩]

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.৬৮৬

২। তদেব;পৃ. - ৭১১

৩। তদেব;পৃ. - ৭১২

এ গল্পের লেখক চরিত্র দ্বিত্ব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। "বস্তুত জীবনানন্দের পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের বিষয় অবলম্বনে লেখা তাঁর প্রায় সমস্ত গল্পেই নায়ক, অর্থাৎ লেখক স্বয়ং এবং মুখ্য চরিত্রে তাঁর স্ত্রী নানা নামান্তরে ঘুরে ফিরে এসেছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোট মেয়ে খুকু, খুকুন বা খোকন জায়গা করে নিয়েছে।"[১] সুহাস চরিত্র সেজে লেখকের জীবন কাহিনী বিশ্লেষণ করে সে। বছর তিনেক হল স্ত্রীটি মারা গেছে, একটি মেয়ে হয়েছিল, সেও নেই আর। প্রাণের রক্তের ভিতর, আত্মার ভিতর বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তার শরীর। লেখক বার্মা, রেঙ্গুন ইত্যাদি জায়গায় ঘুরে বেড়ালেও - রক্তের ভিতর থেকে উঠে আসা হাসি, নিজের অজ্ঞাতসারে কখন মিলিয়ে গেছে জানতে পারেনি সে। স্ত্রী কন্যাকে হারানোর পর কোন এক অদৃশ্য কল্পনা তাকে ঘিরে ধরেছে। সুহাস প্রশ্ন করেছে — "বেশ, কোনদিন কোনো শীতের রাতে পৃথিবী নিজেই যখন মরে গেছে মনে হয় তোমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ায়নি সে?"[২] অসহ্য বেদনা নিয়ে লেখকও দেখেন বৈশাখের অপরূপ দৃশ্য —

> "..... সামনে মাঠের ভিতরে একটা জামরুল গাছ - দু-চারটে কৃষ্ণচূড়া ফুল ধরেছে বেশ, এক কিনারে নারকোলের সারি, পিছনে নীল আকাশ কেমন যেন প্রবাহমান পাখির ডানার মতো চঞ্চল সোনালী রোদের ভিতর দিয়ে উড়ে চলেছে। আকাশে চিলের ওড়াওড়ি, মনে হয় যেন কোনো অদৃশ্য জিনপুরীর প্রাসাদের আবহাওয়ার ভিতর উড়ছে তারা, যেন কোনো রাজকন্যার সোনালী চুলের দিকে তাকিয়ে সোনার রেণুর মতো তাদের কান্না ঝরে পড়ছে।
>
> কোথায় এই দেশ? কিন্তু এদেশে আছে নিশ্চই - কোথাও অনেক দূরের এক পৃথিবী আছে - সেইখানে রোদ, আকাশ, চিলের সোনালী ডানা ও যাদের আঁকাবাঁকা সিঁড়ি সব রয়ে গেছে যেন, হৃদয়ের জন্য নির্জনতা ও শান্তি আছে।"[৩]

ঋতু উপমাপ্রিয় জীবনানন্দ 'কবিতা নিয়ে' গল্পের কাহিনী বর্ণনার সূচনাতেই অসাধারণভাবে নলিনাক্ষ চরিত্রটিকে অঙ্কন করেছেন। পাঁচ হাত লম্বা মানুষ নলিনাক্ষ। অশ্বত্থের মতো কঠিন মাংস দিয়ে তৈরি তার শরীর। তার মাথার ফলন্ত চুলগুলি দেখলে পৃথিবীর ঘাস, পাতা পাখির কথা মনে ভেসে ওঠে। নলিনাক্ষ চরিত্রটিকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে জীবনানন্দ বর্ণনা করেছেন এরকম ঃ

> "তোমার সঙ্গে যখন কথা বলবে হাত ছুঁড়ে, মাথা ঘুরিয়ে, চোখ-দুটোকে কপাল ভেদ করে আকাশের দিকে চিলের মতো উড়িয়ে দিয়ে কঠিন ধাতুর গায়ে কঠিন ধাতুর নিক্ষেপের মতো হাসি ও আওয়াজের সৃষ্টি করে, বাঘের মতন থাবায় টেবিলটাকে একবার আক্রমন করে এক - একটা বইর টুঁটি ধরে সেটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে নলিনাক্ষ একখণ্ড বৈশাখের সমুদ্রের মতো রক্তের অকুতোভয় পরিস্ফূরণ নিয়ে তোমার ঘরের ভিতর বর্তমান থাকবে।"[৪]

১। অম্বুজ বসু : একটি নক্ষত্র আসে / পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯ / চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন, ১৪১১ , পৃ. - ২৮৯

২। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.৭১৬

৩। তদেব;পৃ. - ৭১২

৪। তদেব;পৃ. - ৭২৭

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গল্পটিতে জীবনানন্দ বাংলাদেশেরই প্রকৃতিও মানুষের কথা বলেছেন। কস্তা লাল পেড়ে শাড়ি পরা বউ, খড়ের ঘর এসবের কথা রয়েছে এই গল্পে। এগল্পে আশ্চর্যজনক একটি ঘটনার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় — "মফস্বলের শহরের এক কিনারে গ্রামের রাস্তায় আমাদের খড়ের ঘর সুকৃতি একদিন শীতের অনেক রাতে হঠাৎ জানালায় একজন মানুষের মুখ দেখে ফেলেছিল।"[১] শীত রাতে দেখা এই বিষয়টি স্বপ্ন, না সত্যি ঘটনা সেটা সুকৃতি বুঝতে পারে না। স্বামীর ভালোবাসা পাছে অন্য কেউ দখল করে ভয় পেতে লাগল। জীবনানন্দ এ বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন ঃ

> "স্বপ্ন না হয়ে যদি সত্য হতো' - উঠে বসে আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম
> মুছে নিয়ে সুকৃতি - 'দেখলাম কস্তা লাল পেড়ে শাড়ি পরা এক বউ -
> কি বিচ্ছিরি দেখতে, আমার বিছানার উপর হাঁটু গেড়ে বসে - আমাকে
> দেখছে। ও বাজারে' — বলে কেমন একটা ভয়াবহ ভীষণতার আবেগে
> হো হো করে হেসে উঠল সুকৃতি।
> খুব শান্ত স্বরে - 'দেখলে একজন বউ আর কী হয়েছে, এ তো কিছু নয়।'
> কিন্তু দেখলাম ঘাড় হেট করে কাঁদছে সে।'
> 'তুমি শোও।'
> 'আমি শোবনা, তুমি আমার কাছে বসে থাক।"[২]

এ গল্পের নায়ককে অকারণে সন্দেহ করছে সুকৃতি, বাইর থেকে দেখলে এটাই মনে হয়। নায়ক যদিও অনেক সময় নিজেকে পরিচ্ছন্ন লোক বলে দাবী করেছে। সে বলে তার হৃদয়ে প্রেম বা আকাঙক্ষার সঙ্গে কারোরই যোগ নেই। এমনকি তার হৃদয়েও কোন দিন লাল নীল কমলা রঙের আকাঙক্ষার বাসা বাঁধতে দেয়নি। গল্পকার জীবনানন্দ প্রেমের এই কঠিন শুষ্ক অবস্থা ও অন্যদিকে সন্দেহকে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে শীতের পটভূমি তিনি গ্রহণ করেছেন। এগল্পটি অনেকটাই অলৌকিকতার আবহে লেখা। নায়কের বারবার অস্বীকার, স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া, মিথ্যা বলে প্রতিষ্ঠা করা — নায়িকার মনকে ততবেশি সন্দেহপ্রবন করে তুলেছে। লেখক বর্ণাঢ্যময় পরিভাষা প্রকৃতির অপরূপ রূপ দিয়েছে — "অন্য অনেক পাখি ছিল সেখানে, ছিল অনেক গাঢ় দম্পতি, অজস্র পাখির গ্রহণতা অন্ধকারের স্বপ্নাতুর সাদা মেঘের মতো সেই শহরের জঙ্গলকে কুয়াশার মিষ্টি চাদর দিয়ে ঢেকে দিল যেন। তারপর লেখক জানান জ্যৈষ্ঠ ফুরিয়ে এসেছে। তবুও ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে না শেষ পর্যন্ত এদের মধ্যে দাম্পত্য সমস্যা তেমনি বজায় থাকলো।"[৩]

'পৃথিবীটা শিশুদের নয়' এবং 'করুণার পথ ধরে' গল্পদুটিতে শীত ঋতু বিরাজ করেছে। নায়কের জীবনে সন্ধ্যা ও শীত হঠাৎ করে নেমে আসে। প্রকৃতি প্রেমিক জীবনানন্দ 'করুণার পথ ধরে' গল্পে প্রকৃতির সুনিপুণ বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতির মায়াময় পরিবেশের মধ্যে নায়ক দেখেছে মেয়ে ও তার মার নীল করুণ মুখ। শীত ঋতু এখানে মৃত্যুর ইঙ্গিতে রচিত হয়েছে। প্রকৃতি বুকেও নিঃসঙ্গতা ফুটে উঠেছে। ঠাণ্ডা চাঁদের আলো, চাঁদের ক্লান্ত হিমের ভিতর ছড়িয়ে রয়েছে। হৃদয়কে বেদনা ও অন্ধকারে পূর্ণ করে তুলেছে। তবু মৃত্যুর শান্তি পাচ্ছে না নায়ক তথা জীবনানন্দ। পৃথিবীর এই আঘাত সহ্য করার পর নায়কের সমস্ত শরীর যেন কার্তিকের প্রান্তরের ঘাসের মতো ধীরে ধীরে হলুদ হয়ে ঘাসের মতন আকাশের নক্ষত্র, নদীর দেশের

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.৭৪১
২। তদেব;পৃ. - ৭৪১
৩। তদেব;পৃ. - ৭৪৪

জলের ধূসর নরম ছবি, অমলার বেতের ফলের মতো ম্লান চোখ - সব মিলিয়ে দেখা যায়, কথাশিল্পী জীবনানন্দ ও কবি জীবনানন্দ — দুইয়ের মনন সাযুজ্যে গভীর মিল রয়েছে।

'মায়াবী প্রাসাদ' গল্পে শীত ঋতুর উপস্থিতি রয়েছে। শীতের সন্ধ্যায় হেমন্তের মন বিষণ্ন অথচ শান্ত হয়ে উঠেছে। মাঠের ঘাসের পাতা ঝরেছে - এসব মৃত্যুর ইঙ্গিত রয়েছে। ঘরের ভিতর রয়েছে মৃত মানুষ ও মৃতবিছানা, সঙ্গে আশ্চর্য নীল চেহারার ছবি। গল্পের কথক জানিয়েছে "শীত করছে, এবার শীত আগেই পড়েছে যেন।" সে অনুভব করেছে মৃত মানুষের ভিতর থেকে জীবন্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আবার তাদের গায়েও কেমন মৃত্যুর গন্ধ ধীরে ধীরে বেরোচ্ছে। জানালার ভিতর চিরে শীতের বাতাস একটা কর্কশ রোমশ জন্তুর মতো ঢুকে পড়েছে। মাংসের শীত আস্বাদ, মাংসের ভিতর ঢুকে ঠাণ্ডা জিভ ও দাঁতের মধ্যে অসংযম অবস্থা তৈরি করেছে। সব মিলিয়ে শীত এখানে একটা মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তুচ্ছ শীতকে ঘিরে তাদের মধ্যে দাম্পত্য কলহ তৈরি হয়েছে। —

> "এই গেল শীত যে তোমাকে চার-পাঁচটা গরম জামা তৈরি করে দিলাম,
> কোথায় গেল সে-সব?
> — 'তুমি অত্যন্ত ইতর, কী করে দিয়েছ না-দিয়েছ তাও মনে করে রাখ?
> মেয়েমানুষের বাক্স খুলতে চাও - যাও আমি গরম জামা গায় দেব না,
> আমার শীত লাগে না।' 'শীত লাগে না? সাপের জাত তোমরা - শীত
> লাগবে না' দাও আমার গেঞ্জি আর ফ্লানালের শার্টটা দাও তো।"[১]

জীবনানন্দের গল্পের নায়ক চরিত্রগুলি প্রকৃতি দেখতে ভালোবাসে। এই গল্পের নায়ক চরিত্রটিও তার ব্যতিক্রম নয়। কারণ খোলা প্রকৃতিই মানুষের হৃদয়ের গাঢ়তা তৈরি করে। শীত হলেও তার আকাশ, অজস্র তারা হৃদয়ে মায়াবী প্রাসাদ তৈরি করতে পারে। নির্মলার হৃদয়ের ভিতর কোনো অবসাদ নেই। গল্পের কথকের মনের ভাবনা প্রার্থনার মতো গভীর। কথক এ পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোন আশ্চর্য নতুন পৃথিবীতে যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। আর নির্মলা এই পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক এক নারী হয়ে অনুভব করে -—

> "শীত করছে, ফিরোজা রঙের চাদরটা এইবার গায় দেওয়া যাক।"[২]

জীবনানন্দের একাধিক গল্পের পটভূমিতে রয়েছে শীত ঋতু। 'অস্পষ্ট রহস্যময় সিঁড়ি' গল্পের নায়ক বলেছেন — 'বরং জীবনের কিনারা ঘেঁষে, মৃত্যুর অশরীরের অস্পষ্ট গন্ধের ভিতর, যে সমস্ত গল্পের জন্ম, সেগুলো নেড়েচেড়ে হেমন্তের সন্ধ্যা ও রাত্তির বেশ কেটে যায় আমার।"[৩] বাবা, স্ত্রী কমলার সঙ্গে নায়ক কালাতিপাত করে। তবু নায়ক স্পষ্ট-অস্পষ্ট এক অনুভূতি নিয়ে গল্প লেখে, গল্প পড়ে। তার কারণ সম্পর্কে বলেছেন —

> "কোথাও পৃথিবীর পথে কোনোদিন কাউকে ভালোবেসেছিলাম। সেই
> নারী আমাদের পৃথিবীর পথে আজ আর নেই, তাকে খুঁজে বার করবার
> কৌতূহলে রহস্যময় সিঁড়ির প্রথম অস্পষ্ট ধাপের মতো এই এই বইগুলো
> এনে হাজির করেছি আমি।"[৪]

কথক হেমন্তের সন্ধ্যায়, বিস্মিত হয়ে মৃত্যুর ধ্বনি শুনেছেন। অনেক দিনের মৃত তরমুজের আঘ্রাণকে অনুভব করেছেন, মৃত ঘাসের গন্ধ এবং মৃত পাথর, মৃত কদম ফুলের, মৃত শেফালিকা পাতার

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.৭৫৮
২। তদেব;পৃ. - ৭৬২
৩। তদেব;পৃ. - ৭৬৩
৪। তদেব;পৃ. - ৭৬৪

নেতিবাচকতাকে অনুভব করেছেন। কার্তিকের তুচ্ছ শীত রাতকে কথকের মনে হয়েছে যেন মাঘের মতো শীত এবং কী লম্বা রাত। কার্তিকের শীতে খুব নিস্তব্ধতা অনুভব করে, নিজেকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তার মনে হয়েছে যেন সে অনেক দিন আগে মরে গেছে। মৃত শরীর ও মনের উপর দিয়ে অদ্ভুতভাবে যেন দিনরাত শব্দ করে চলেছে। নির্জনতা তার খুব প্রিয়। সবচেয়ে বিশ্রী ও বেদনাদায়ক মৃত্যুকেই সে সবচেয়ে গভীরভাবে অনুভব করে। অন্ধকারে, নির্জনতায় বসে সে শুধু অস্পষ্ট রহস্যময় সিঁড়ি তৈরি করে — যেখানে মা-বাবা-স্ত্রী কেউ নেই, আছে শুধু সেই কোন একদিনের ভালোবাসার নারী। তাকেই খুঁজে পাওয়ার জন্য কথক চুরুটের ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে রহস্যময় অস্পষ্ট সিঁড়ি তৈরি করে চলেছে। কিন্তু সেই নারী বেঁচে আছে না মৃত শিউলির মতো ঝরে পড়েছে তা কথকের জানা নেই।

'মৃত্যুর গন্ধ' গল্পের শুরু হয়েছে বৈশাখের অসহনীয় অবস্থার বর্ণনা দিয়ে। "বৈশাখের সন্ধ্যা, অসহ্য গরম, কিছুক্ষণ আগে খানিকটা মেঘ করিয়া গুমোট হইয়া গরম যেন আরো ঢের বাড়িয়া গিয়াছে।"[১] 'মৃত্যুগন্ধ' গল্পের নামকরণ হলেও যেন মৃত্যু নয় জীবনকেই লেখক উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে তেমনি আকাশে কালো মেঘের সমারোহ দেখা গেলেও, বিদ্যুৎ বার বার জ্বলে উঠলেও, মেঘের হাঁক-ডাক আকাশ ও পৃথিবীতে ছেয়ে গেলেও জল লেশমাত্রও হল না। নদীর ডালের উপর দিয়ে বয়ে আসা শো-শা বাতাস হঠাৎই নিঃস্তব্ধ হয়ে গেল। মেঘ কেটে গেলে আকাশে কালপুরুষ, ছায়াপথ ইত্যাদি সাজসজ্জায় আর্বিভূত হল। হেমন্তের মস্তবড় একান্নবর্তী পরিবারে তার স্ত্রী নীলিমা অসুস্থ থাকে প্রায়ই। তারজন্য হেমন্ত ডাক্তার, ঔষধ, ফল ইত্যাদি এনে দেয়। এ নিয়ে সংসারের পাঁচজনের ভিতর বিমুখ, বিরস আলোচনা হয়, হেমন্ত মনে করে আশাতীত সুন্দর আকাশে দূর নক্ষত্রগুলোর ভিতর কিংবা অন্ধকারের রহস্যে মৃত্যুর নিদ্রার দেশে নীলিমা চলে যাচ্ছে। তাতে সে শান্তি পাবে। আবার পরক্ষণেই নীলিমার অসহায় শিশুকন্যার মতো ব্যাকুল ডাকে হেমন্তের কেমন নীরব নিবিড় পিতৃত্ব জেগে ওঠে। বার বার অসুস্থ নীলিমার জন্য হেমন্তের দাক্ষিণ্য, সহিষ্ণুতা ভালো লাগেনা। তাই বধূকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে অনুভব করে হৃদয়ের ভিতর সান্ত্বনার ভাষা শুকিয়ে গেছে। শুধু নীরব হাসি দিয়ে হেমন্ত কাজ মেটায়। তার মনে হয়, একজন মুগ্ধ সুন্দর গৃহবধূ নিপুণা সেবারতা উৎসবমুখর স্বাভাবিক নারীর জন্য প্রাণ অপেক্ষা করে আছে। তার জীবনে কি এমন রূপান্তর ঘটবে। নীলিমা এখন সবারই বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একমাত্র আশ্রয় হল মৃত্যু। এখন হেমন্তের জীবনের পট পরিবর্তন হয়ে গেছে। নীলিমা কোথায় হারিয়ে গেছে তার হৃদয় রাজ্য থেকে। আর তাকে খুঁজেও দেখতে যায় না হেমন্ত। - এর পর নীলিমা বাপের বাড়ি যায় ছয়মাসের জন্য। আর ফিরতে হল না নীলিমাকে - এখানেই গল্পটি শেষ। নীলিমার নীরস জীবন সাদৃশ্যের সঙ্গে গল্পকার গ্রীষ্ম ঋতুঘন অসাধারণ পরিবেশ তৈরি করেছেন এ গল্পে।

প্রকৃতি বর্ণনা প্রিয় লেখক জীবনানন্দ। গল্প-কবিতা-উপন্যাসে একটু সুযোগ পেলেই প্রকৃতির কথা লিখতে বসে যান। 'জীবনের অন্তঃপুর ও তেপান্তর' গল্পে তিনি এমন এক চরিত্র নির্মান করেছেন, যে চরিত্রটি কোন দিন প্রকৃতির সৌন্দর্য অনুভব করার ফুরসুৎ পায় নি। এই চরিত্রের সঙ্গে জীবনানন্দের মায়ের চরিত্রের খুব মিল লক্ষ্য করা যায়। যার অন্তরে সোঁদা মাটির গন্ধে ভরপুর সে সাংসারিক কাজে নিযুক্ত থাকার ফলে সে বিলাসপূর্ণ জীবন কাটানোর কথা ভাবতে পারে না। এগল্পের নায়ক এমনই এক চরিত্রকে দেখে বলেন, — "ডালপালার ভিতরে কতগুলো জোনাকি। মনে হয় ধুলোর মন্ত্র যদি আমার হাতে থাকিত তাহা হইলে

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.৫৮০

এ সংসারের এই বধূ জীবন হইতে মুক্ত করিয়া তোমাকে জোনাকির রূপ দিয়া ঝুলকরবী জামরুলের পল্লবস্নিগ্ধ অন্ধকারের মধ্যে ভাসাইয়া দিতাম। সে ঢের ভালো হইত।"[১] এ নারী কপালের ঘাম আঁচলে মুছিয়া নিজের পরিশ্রমকে হাল্কা করে। দেবর-ভাসুর-ননদ-সংসারের সবাইকে খুশি করার চেয়ে দামী জিনিস পৃথিবীতে আছে কিনা উপলব্ধি করতে পারে না। স্থির হয়ে বসা মানে খিলি খিলি পান তৈরি করা। শরতের সৌন্দর্যে ভরা এই নারী চরিত্রটি তাকে নিয়ে এ গল্পের কথক ভাবে, আশ্বিনের বাতাসের মতো সুন্দর প্রবাহের মধ্যে তার জীবনকে মিশিয়ে দেবেন, যদিও নারীটি ঐকান্তিকতায় ও আত্মত্যাগে মহীয়সী। —

> "জীবন বলিতে তুমি আশ্বিনের রৌদ্রে দীপ্তিমান শঙ্খচিলের কথা কল্পনাও করিতে পার না, জ্যোৎস্নার পরে জঙ্গলে শিশু অর্জুনের ছায়ায় সুন্দর উজ্জ্বল চিতাবাঘকেও না - কাদা ধুলা ঘাস ও পানকৌড়ির ডানার গন্ধে ভরা অষ্টপ্রহর ব্যবহৃত খিড়কির পুকুর হল তোমার জীবন, পুকুরের মতো হল তোমার জীবন। একদিন ছিল বটে, কিন্তু পানকৌড়িরাও আজ আর সেখানে নাই। উপবনে জমিয়া উঠিয়াছে, কাদা হইয়াছে স্তূপীকৃত, জল নীল নিস্তেজ।"[২]

গল্পের কথক মাকে চিঠি লিখতে গিয়ে অতীত প্রিয়ার স্মৃতিচারণ করেছে। যে চারুলতা পনেরো-বিশ বছর আগে এই গল্পের কথকের সঙ্গে ঘর বাঁধতে পারতো সে আজ। বধূরূপে হয়তো অন্য কোনখানে আছে। জননী-মা-বধূ সমস্ত নারী রূপা প্রকৃতিতে কথক এক নারীর প্রতিকৃতিকেই দেখতে পায়। তাই বলেন, - "আমার বোন আমার বধূ আমার জননী সমস্তইতো ইচ্ছামতী।"[৩]

কথাশিল্পী জীবনানন্দ মানব মনের বিভিন্ন অবস্থাকে ঋতুর অনুষঙ্গে প্রকাশ করেছেন। 'গ্রাম ও শহরের গল্প' - এর শুরুটাই এরকম — "শীত রাত — প্রকাশ সোমেনকে নিয়ে তার স্ত্রীর ঘরের ভেতর ঢুকল।" শীতের ভিতরেও প্রকাশের কপাল ঘেমে উঠেছে দেখে শচী আঁচল দিয়ে আস্তে আস্তে স্বামীর কপাল মুছে দিচ্ছে। চারিদিকে পাড়াগাঁর শীতের রাত নিঃস্তব্ধ। সুপুরির কুঁড়ি কিংবা আমের মুকুল ঝরার টপ্ টাপ্ টপ্ টাপ্ টপ্ টাপ্ - আওয়াজ শোনা যায়। হঠাৎই শচী বুঝতে পারে প্রকাশ হুইস্কি খেয়েছে। তখন শচীর হৃদয়ের ভালোবাসা, ক্ষমা সবমুহূর্তের মধ্যে ভুলে গেল। শচীর বড্ড ঘুম নেমে আসে। সে প্রকাশের বুকের ভেতর মুখ রেখে সিগারেট চুরুটে অ্যালকোহলের কটকটে গন্ধের ভিতর ক্ষমার সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে। শচী এক ভাবুক মহিলা, সে পুরুষ মানুষদের শখ-আহ্লাদ সম্পর্কে অন্যরকমভাবে মনকে বোঝায়। হুইস্কি, চুরুট, এসব পুরুষদের জীবনের অর্জ্জিত অধিকার। অথবা অনেক সময় পুরুষেরা এসব নেশা করে "শীতরাত বলে? না শীত রাতের ওপর বৃষ্টির আরো কনকনে হাওয়া সেই জন্য? না দিনরাতের বিদঘুটে পরিশ্রমের চাপে পড়ে?"[৪]। শচী তার স্বামী প্রকাশের পাশে সোমেনকে রেখে তুলনা করেছে 'জীবনের কারবারে শচীর প্রতিকার হৃদয়াকাঙ্ক্ষা বোঝ'? স্বামী ও সোমেন এবং নিজের জীবনের বাস্তব সম্বন্ধটা কি শচী খোঁজার চেষ্টা করে। শচীর চিন্তার ভেতর একটা বুদ্ধির প্রখরতা দেখা যায়।

> "তারপর গভীর রাতে - শীতের গভীর রাতে - বুঝতেই পারে না শচী - সোমেন বলে একটা লোক আছে কিনা - তার কোনো মূল্য আছে কিনা

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.৬০৬
২। তদেব;পৃ. - ৬০৩
৩। তদেব;পৃ. - ৬০৯
৪। তদেব;পৃ. - ৬৩৬

- পৃথিবীর কোনো দরকারেই তার কোন প্রয়োজন আছে কিনা - বাস্তবিক রক্তমাংসের কোন অবয়ব বা মুখও আছে কিনা সোমেনের - এই ভাবে শচী শীতের রাত - শীতের গভীর রাত - বাংলার শীতের গভীর রাত প্রকাশ আর তাকে নিয়ে যেন কোন বাংলার মাঠে আমনের ক্ষেতের পাশে টুপুর - টাপুর শিশিরের ভেতর কোন মধুমতী কর্ণফুলী অরিয়াল খাল, নদীর কিনারে প্রোথিত করে রাখে।
— হা ভগবান, প্রোথিত করে রাখে যেন।"[১]

সোমেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ, তার মন এখন সমস্ত চাওয়া পাওয়ার বাইরে চলে গেছে। সোমেন বলে, - "তোমাকে নিয়ে সেই বকফুল বনধুঁধুল কলমীলতা বাঁশবনের ভিতর গেলে আমি তো আর ফিরে আসতে পারব না। কিন্তু কথা হচ্ছে যা ছিলাম আমরা তা নেই আমরা -। .... মানুষ যে লোভে তাজমহল দেখতে যায় - ঠিক তেমনি .... ভাবপ্রবন হয়ে, হয়তো চোখের জল ফেলবে আমাকে জড়িয়ে ধরবে, চুমো দিতে দেবে - কাঁধে মাথা রেখে কাঁদবেও হয়তো - হয়তো আর ফিরেও যেতে চাবেনা - .... পরদিন ভোরেই তুমি এক সাঁতারে বারো, চৌদ্দ বছরের ওপারে চলে যাবে; কে তোমাকে ধরতে পারবে?"[২]

জীবনানন্দের অনেক গল্পে শীতের সময় বৃষ্টির সমারোহ দেখা যায়। এসব গল্পের মানুষের আত্মার আকাঙ্ক্ষা আলাদা। গল্পের কথক শৈলেন কবিতা লেখে। সে কবিতাকে নারীর চোখে দেখে। নারীকে অনুসরণ করতে গিয়ে অনেক মানুষ যেমন পৃথিবীর অনেক জিনিস উপেক্ষা করে, শৈলেন জীবনে অনেক জিনিস প্রত্যাখান করেছে। সে ভাবে সৃষ্টি হবে অনুভবের প্রতীক। নিঃশেষিত কামনা থেকেও ছিয়াশি বছরের বৃদ্ধ আর্টের জন্ম দিতে পারে। সুন্দরী নারীর সংস্পর্শে এসে নিজের রক্তমাংসকে শুয়োরের মাংসের রক্তের মতো মনে হয়। শৈলের সঙ্গে তার স্ত্রীর কোন দাম্পত্য সমস্যা নেই, তবুও তার মনে হয় তার স্ত্রীকে সমস্যার কুয়াশায় দিনরাত কে যেন আছাড় মারছে। তবু এরকম স্ত্রী নিয়ে জগৎ সংসারের মানুষ সুখী। করুণার রূপ যে প্রেমের থেকেও গভীরতা চিনিয়ে দেয় তার স্ত্রী। তাই স্ত্রীর মৃত্যুর পরও সে আশ্চর্য অনেক কবিতা লিখতে পেরেছে, কিন্তু তার মৃত্যুকে উদ্দেশ্য করে শৈলেন একটিও কবিতা লেখেনি। সে তার স্ত্রীর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে মনে। - "শীতের সময়, অনেক রাত অন্ধকারের ভিতর হিম হয়ে খুলে রয়েছে। অনেক রূপসী মুখ ভুলে গেছে, কিন্তু সেই রুলি আর হাত কোনও দিনও ভুলবনা।"[৩]

গ্রীষ্মের খরতাপ, বর্ষার সজল ধারার স্পর্শ, শীতের ধূসর চেহারা, বসন্তের পুষ্পবাহার, হেমন্তের হিমেলশয্যা প্রকৃতির বুকে নেচে বেড়ায়। বর্ষায় যেমন শুষ্ক শতদীর্ণ মাটি সরস হয়ে ওঠে, তেমনি মানুষের হারানো প্রেম, ব্যর্থ প্রেম - সবই সজীব হয়ে ওঠে। জীবনকে রহস্যময় করে তুলতে চায় 'এক এক রকম পৃথিবী' গল্পের রামজীবন। এগল্পের অরেকটি চরিত্র অবিনাশ। সেও প্রকৃতিভাবুক এক ব্যক্তিত্ব। সে বলে-

"আমার মনে হয় আষাঢ়ের অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় আমাদের ধূসর বাড়ির
একটা কামিনী গাছের জন্ম যদি পেতাম, ঝিনুকের মতো ম্লান সেই

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.৬৪২
২। তদেব;পৃ. - ৬৪৬
৩। তদেব;পৃ. - ৬৭২

জ্যোৎস্না, পৃথিবী ভিজে উঠছে, কামিনী গাছ ভিজে যাচ্ছে ঝিনুকের মতো ধূসর খইয়ের মতো কোমল বৃষ্টির ফোঁটায় ফোঁটায় কামিনীর ডালপালার ভিতর ব্যথিত পাখির মতো খচ্‌খচ্‌ করছে কোথাকার কে যেন এক গোখুরা নারী — ”[১]

মানুষের শরীর ও মনের উপর ঋতুর প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গ্রীষ্মের দাবদাহের পর বর্ষার বর্ষণ ও ঝোড়ো হাওয়ার মাতন মনকে দেয় নাচিয়ে, প্রাণে আসে শান্তি ও মধুরতা। বর্ষা প্রিয় মিলনের আকাঙ্ক্ষাকে বড়ো বেশি উদ্বেল করে তোলে। আষাঢ়ে বিরহ ও শ্রাবণে প্রিয় মিলনাকাঙ্ক্ষার ইচ্ছা তৈরি হয়। তাই অবিনাশের কথার সঙ্গে সুর মিলিয়ে রামজীবন বলে — “একদিন আষাঢ়ের জ্যোৎস্নায় কোনো এক পুরোনো নির্জন বাড়ির পালঙ্কে শুয়ে কোন এক সাপিনীকে দেখতে হবে আমায় অবিনাশ।”[২]। অবিনাশ বুঝতে পারে তার হৃদয়ের কথা রামজীবনের জিভের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। ঝিনুক, কড়ি, কার্তিকের কুয়াশা, সাপ, মেয়ে মানুষ এসব একটা অদ্ভুত আত্মীয়তা সূত্রে মনে বা স্বপ্নের ভিতর ধরা দেয়।

জীবনানন্দের কয়েকটি গল্প ঋতুর নামেই বা ঋতুর অন্তর্ভুক্ত মাসের নামেই নামাঙ্কিত। যেমন — ‘উপেক্ষার শীত’, ‘হেমন্তের দিনগুলো’, ‘শীতরাতের অন্ধকারে’, ‘অঘ্রাণের শীত’ ইত্যাদি। হেমন্তপ্রিয় কবি জীবনানন্দ তাঁর ‘অঘ্রাণের শীত’ গল্পে হেমন্তের বর্ণনায় ব্যস্ত —

“ছোট হেমন্তের দিনগুলো দেখতে দেখতেই বেলা ফুরিয়ে যায়। চারদিকে কেমন একটা নিস্তব্ধতা ও নিঃশেষের গন্ধ। বাড়ির আশেপাশে ধানের খেত সব হলুদ হয়ে গেল। তারপর ধান কাটার পালা সব শেষ হয়ে গেল। চারিদিকে বাদামি খড় পড়ে আছে। যেখানে সবুজ ধানের খেতগুলো ছিল সেখানে এখন অনাদি বিস্তৃত ফাটলওয়ালা মাঠ। মাঠের পর মাঠ। ..... রাস্তার পাশে একটা নিঃসঙ্গ কুলগাছ..... তারই ভেতর গোটা দুই ঘুঘু শীত রাতের অপেক্ষা করছে।”[৩]

গল্পকার জীবনানন্দ নিস্তব্ধতা ও নিঃশেষকে গন্ধের দ্বারা অনুভব করছেন। আসলে কবির কাছে স্পর্শানুভূতিটাই বড়। সবকিছু বিষয়ে রূপ-রসকে গন্ধ বা স্পর্শ দিয়ে অনুভব করতে চান। হেমন্তের দিনগুলো শেষ হয়ে শীতের আগমন কেমনভাবে প্রকৃতিকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করেছে - তার বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যা হওয়া, কুয়াশা পড়া অন্ধকার নামা নির্জন প্রান্তরে একা ঘুরে বেড়ানো কবির দেওয়া এই রকম শীত ঋতুর নিবিড়তার নানা চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে। জীবনানন্দ নিজেই বলছেন —

‘শীতের রাত এমনি ধীর মধুরভাবে হেঁটে চলে, এইসব রাতকে আমি বড্ড ভালোবাসি। ..... যেমন অন্ধকার তেমনি শীত আর আকাশ ভরে তেমনই নীহার স্রোত।”[৪]

রাতের পৃথিবীটা যেন শ্যামা পোকাদের জোনাকিদের লক্ষ্মীপেঁচাদের আর ইঁদুরের। অশ্বত্থ গাছের ডালপালায় মিটি মিটি জোনাকির দল কেমন করে এরা শিশিরমাখা ঘাসের উপর নেমে এসে তাদের আলোয়, ঘাসের

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.৬৭৯

২। তদেব;পৃ. - ৬৭৯

৩। তদেব;পৃ. - ৩৯৬

৪। তদেব;পৃ. - ৩৯৬

শিষকে সবুজ করে তুলল - এসব গল্প ও এদের ভাষা জানার জন্য কবি সমস্ত জীবনটাকে উৎসর্গ করে দিতে চান। কবির ভবিষ্যদ্বানী —

> "তখন খুব নীরব ঠাণ্ডা, ঘন নিবিড় নারকেলের পাতায় নিবিড় জোনাকির মালায় মালায় ভরা খুব চমৎকার শান্তির রাত আসবে তখন। একদিন আসবেই। মানুষ তখন থাকবে না।"[১]

কবি ভবিষ্যৎ জীবনের কোঠায় কোঠায় শূন্যতা আর শুষ্কতাকে উপলব্ধি করেছেন। কারণ কবির দেড় বছরের ছেলেকে প্রবঞ্চিত হতে দেখেছেন। মুখে তার এই বয়সেই কেমন বিমর্ষতার অবসাদ। এসবের পেছনে শীত ঋতুর শুষ্কতা ও বিষণ্ণতা রয়েছে। উমা ও কবি দুজনে হেমন্তের বিকেলের ম্লান রোদ উপভোগ করতে ভালোবাসেন। শকুন দেখে উমা ভয় পায়। কিন্তু কবি কাকাতুয়া, ফিঙে পাখি, বাবুই, বউ কথা কও: ঘুঘু পাখিদের প্রতি এক আকর্ষণ উপলব্ধি করেছেন। তাদের লাফালাফি, চিৎকার, কাড়াকাড়ি কবিকে মোহময় করে তোলে। অঘ্রাণের শীত বিকেলবেলাতে খুব মৃদু প্রকৃতির থাকে। সেই সময় সোনালি রোদের ভেতর কবি পাখিদের কলকাকলি উপভোগ করেন। স্ত্রী উমা ভয়াতুরা, তাকে কবি আপন অনুভূতি প্রদান করেন। শীত ঋতুর অনালোকিত অবসাদকে বোঝান। পাড়াগাঁয়ের শীত ও কলকাতার শীতের মধ্যে পার্থক্য দেখান। শীতকালে রাত দশ টার সময় পাড়াগাঁয়ে লেপের ভিতর ঘুমে অবসাদ এসে যেত। কিন্তু কলকাতায় থাকলে এই সময় হয়তো পার্কে বসা হতো, হেঁটে বেড়ানো হতো। পার্কে বা মনুমেন্টটার কাছে বসে ভবিষ্যৎ জীবনের হিসেব-নিকেশ করা হতো। সত্তর টাকার চাকরি নিয়ে কিভাবে সংসার চালানো যায়, তার একটা খসড়া করতে বসে পড়তো উমা। কবির ভাষায় —

> "এমন কত খসড়া তার বসন্তের বাতাসে লেখা হয়েছে কালবৈশাখীতে উড়ে গেছে। জ্যৈষ্ঠে তৈরী হয়েছে আবার আষাঢ় শ্রাবণের জলে ভিজে গেছে। আশ্বিনে গড়া হয়েছে ফের হেমন্তের হিমে হিমে চিম্‌সে গেছে।"[২]

বহমান জীবন এভাবেই কালের নিয়মে এগিয়ে চলে। ঋতু অনুযায়ী মনের আশা-নিরাশার ভূমিকা-উপসংহার হয়। ভাগবতে বলা হয়েছে — 'আশাং পরমং দুঃখং, নিরাশাং পরমং সুখম্' — অর্থাৎ আশায় দুখ আর নিরাশায় সুখ। কিন্তু সমাজবদ্ধ জীব তা না বুঝে স্বপ্ন দেখে। 'অঘ্রাণের শীত' গল্পে উমা নামক নারী চরিত্রটিও স্বপ্নের পাহাড় তৈরী করেছে। সে জীবনটাকে একটু অন্যরকমভাবে দেখে। পাড়াগাঁয়ের পথে-রোদে রোদে, সর্ষের ক্ষেতে, অপরাজিতা ফুলে, প্রজাপতির জীবন সঙ্কটে, বলে — 'এরা বেঁচে রয়েছে, বেঁচে থাকে।'[৩] রুগ্ন শরীরী উমা, আশা করে, অপেক্ষা করে, বিশ্বাস করে, জীবনকে শ্রদ্ধা করে, ভগবানের উপর নির্ভর করে। শেষে মারা যায়। কেন মরে - কেউ জানে না। জীবন এরকমই। মৌমাছিকে দাঁড়কাক ঠুকরে খাচ্ছে, ছোট ছোট ছেলেরা প্রজাপতির পাখনা ছিঁড়ে খেলা করছে — এসব কবি, কবির জীবন দেখেছে। কলকাতার মতো অত্যন্ত অসার জায়গায় এসব উপলব্ধি ঠিকঠাক ঘটে না। তবে পাড়াগাঁয়ে ঘটে। কবির উপলব্ধি —

> "জীবন এইরকম। সে আমাকে আজও বাঁচতে দিয়েছে, খেতে দিয়েছে, জীবনের অন্ধতা ও ভয়াবহতার সম্বন্ধে কলম ধরে লিখতে দিচ্ছে, এই তার যথেষ্ট দান ..... হেমন্ত শীত বসন্ত জীবনটাই পাড়াগাঁয়ের পথে কাটাতে ইচ্ছা করে।"[৪]

'অপেক্ষার শীত' গল্পে শরদিন্দু ও অরুর ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী রয়েছে। দু'জনের কথোপকথনে শীত ঋতুর অসাড়তা, তার নিষ্ফলতা প্রকাশ পেয়েছে —

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.৩৯৬
২। তদেব;পৃ. - ৪০৫
৩। তদেব;পৃ. - ৩৯৬
৪। তদেব;পৃ. - ৪১০

"কিন্তু তোমার ভালোবাসা আমাকে, কী দিয়েছে? কুম্ভীপাকের যন্ত্রনাও না, স্বর্গের চরিতার্থতাও, না-নির্জীব পৃথিবীর, হয়তো মেরুর দিকের, পৃথিবীর খানিকটা অসাড়তা, প্রাণহীনতা, অকৃত্রিম কৃত্রিমতা তার নিষ্ফলতা, তার শীত, এই তুমি দিয়েছো।"[১]

শরদিন্দু বিয়ে করতে যাচ্ছে। জববলপুরের মেয়ে অরু, শরদিন্দুর জীবনে প্রেমিকার রূপ ধরে একবার এসেছিল। এখনও সে আছে। শরদিন্দুর বিয়ের কথা চিঠিতে জানা মাত্রই অরু জববলপুর থেকে বাংলাদেশের সামান্য একটা স্টীমার স্টেশনে একা একা চলে এসেছে। প্রেমিকের বিয়ে উপভোগ করার, অনুভব করার জন্যই তার আগমন। বউদিকে নিয়ে সে মজা করবে। তার মনের প্রফুল্লকে শরদিন্দু ব্যাখ্যা করে এভাবে —

"হেমন্তের জ্যোৎস্নারাতে হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাবার পর নারকেল গাছের পাতাগুলো চাঁদের আলোয় চিক্‌চিক্ করে উঠে এই রকমই প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। তোমার এই পরিতৃপ্তির স্বাভাবিকতা বুঝতে গিয়ে মানুষের সমাজ সংসার ছেড়ে বার বার আমি ঘাস পাতা নক্ষত্র সৃষ্টির — বুঝে নিয়েছি।"[২]

একজন পুরুষমানুষের জীবনে কামনা অনেকবার আসে। আকাঙ্খা ও লালসা একজন সুস্থ মানুষের শেষ বয়স পর্যন্ত জাগতে পারে। কিন্তু শরদিন্দুর মনে হয়েছে যে, ভালোবাসার জন্য একটা উপযুক্ত বয়সের দরকার। কারণ আমাদের কল্পনা বা হৃদয়ের রং-রস শীতের চেয়ে তার বিশ্বাস উদ্যমতা আবেগ ও উত্তাপকেই শুধু বেশি করে চায় না, শরীরের ওপরও এর পুরোপুরি দাবি রয়েছে। তাছাড়া নিজের মনের মধ্যে যখন অবিশ্বাস, শীতলতা, অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ তামাসাবোধ আসবে, তখন ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যাবে। তখন উপযুক্ত কোনো মেয়ে এসে পড়লেও মন অসাড় থাকবে। কারণ প্রাণের সেই উপকরণগুলো না থাকায় তা ভালোলাগবে না। শরদিন্দু যেন শীত ঋতুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মনকে একরকম অসাড় করে ফেলেছে। —

"কোনো এক শীতাক্ত প্রদেশের নিশ্চলতায় অসাড় হয়ে পড়েছে সে। অরুর ঘাড়ের ওপর স্তব্ধভাবে মাথাটা রেখে কর্তব্য অকর্তব্য ভুলে যাচ্ছে সে। আস্তে আস্তে তার মাথাটাকে সরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে অরু চলেছে - 'অনেকক্ষণ তুমি আমার কাছে বসেছ - এখন যাও,"[৩]।

জীবনানন্দের প্রেমিকরা প্রায় শীত ঋতুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এখানে শরদিন্দুও একই। জীবনানন্দের শীতঋতু-মন খারাপ করার ঋতু। 'শীতরাতের অন্ধকারে' গল্পটিতে জীবনানন্দ জীবনের ব্যর্থতা - বেদনার চিত্র এঁকেছেন। শীতরাতগুলো নিস্তব্ধ অলসভাবে কাটে। শীত ঋতুর নামাঙ্কিত গল্পে প্রকৃতির চিত্র, বলা ভালো হেমন্তের চিত্র ফুটে উঠেছে —

'সজনে গাছটার গায় বেশ খানিকটা রোদ এসে পড়েছে। পাতাগুলো শিশির ভেজা। কয়েকটা নিকষ কালো দাঁড়কাক ডালে ডালে বসে খুনসুটি করছে, পাতা ঝরছে আর একটু - আধটু শিশির।"[৪]

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.- ৪৪

২। তদেব;পৃ. - ৪১

৩। তদেব;পৃ. - ৪৬

৪। তদেব;পৃ. - ৩৭৩

জ্যোৎস্না রাতের উঠানে পায়চারির কথা, হিজলগাছে পেঁচার ডাকাডাকি, বাদুড়ের নাচানাচির মধ্যে কবিমন বেদনাহত। এ গল্পে লেখক বিধবা পিসিমার কোন এক শীত রাতের জীবনচিত্রের বর্ণনা করেছেন এরকম—

> "বিধবা পিসিমা তার ছোট্ট একচালার রোয়াতে বসে ধানশস্য হেমন্তের মাঠটার দিকে তাকিয়ে নিশ্চয় জড়পিণ্ডের মতো বসে থাকে। তারপর প্রদীপ জ্বালিয়ে ছাতু গুঁড়ো করে তার বিধবা মেয়েটিকে খেতে ডাকে। দুটি বিধবা মুখোমুখি বসে খায়। তারপর খড়ের চালের নীচে শীতরাতের অন্ধকারে পাশাপাশি শুয়ে থাকে।"[১]

জীবনের ব্যথাতুর চিত্রকে তিনি প্রায়শই শীতঋতুর অন্ধকারের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাড়ির কাকা, বাবা, পিসিমা - সকলেই বুড়ো। এই শীতে যদি তারা সকলেই শেষ হয়ে যায়, তাও খুব স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু তারা সব বেঁচে আছে। বাবা ভাঙা কলকব্জা বিগড়ানো প্রেস নিয়ে পড়ে থাকে। জেঠামশায় ঐকান্তিক শিল্পীর লক্ষণ নিয়ে জীবন কাটায়। শীতে-গরমে একটা কমফরটার (মাফলার) বেঁধে রাখেন। তাঁর জীবনে সবচেয়ে আমোদ হল - ওপরের ক্লাসের ভূগোল খাতা যখন তাঁকে দেখতে দেয়। শীতরাতের ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করে, চোখের অস্পষ্টতাকে উপেক্ষা করে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। লেপের ভেতর ঢুকে মরিচ দিয়ে ভাজা কড়াইশুঁটি চিবুতে থাকেন। এভাবেই শীত কাটে। গল্পকারের কথায় —

> "এরকম করে শীতের মাস কটা কেটে গেল, ব্যথায় নিস্তব্ধতায়। কিন্তু বিশেষ কোনো বিপদ হল না। কাকা জেঠামশায় দুজনেই বেঁচে রইলেন। প্রেসটাও ভেঙে চুরমার হয়ে গেল না। বুড়ো মানুষদেরও কাজেকর্মে চাকরিতে ও কোনো ব্যাঘাত পড়ল না।" [২]

শীত ঋতুর ব্যর্থতা-বেদনাকে অতিক্রম করে জেঠামশায় ভূগোল পড়ানোর আনন্দে মেতে ওঠেন। এই গল্পে জীবনানন্দ দেখাতে চেয়েছেন শীত মানেই অলসতা, ব্যর্থতা কিন্তু মৃত্যু নয়। তা জীবনের স্বাদকে উপলব্ধি করার অন্য এক মাধ্যমও। তাইতো জেঠামশাই স্কুলের বাইরে রোদ্দুরে বসে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোকজনদের জ্ঞানের আনন্দ দিতে থাকেন। এখানেই শীত হল জীবনমুখী। 'শীতের দিনগুলো' গল্পে জীবনানন্দ - অসিত, তার স্ত্রী সীতার ও তাদের একটি মাত্র ছেলের প্রাণসরিৎসাগরের উচ্ছলতা প্রকাশ করেছেন। কলকাতায় থাকা অসিতের হেমন্তের দিনগুলো কেমনভাবে কাটে তার বর্ণনা এখানে রয়েছে —

> "হেমন্তের দিনগুলো কলকাতায় কেটে যাচ্ছে।
> যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে — এখন যুদ্ধের পরের পৃথিবী। প্রকাণ্ড উৎকণ্ঠার পর এসেছে তত বড় অবচনীয় অবসাদ, — উৎকণ্ঠা তো রয়েই গেছে।"[৩]

কলকাতার হেমন্তে অবসাদ আসে, আর পাড়াগাঁয়ের হেমন্ত অপরিসীম উজ্জ্বলতা বয়ে আনে। নদীর নিঝুম জল, নৌকোর কোমল ধূসর রঙ, রোদের ফাঁকের ভেতর চাতকের খেলা — এসব অসিতকে খুব টানে।—

> "রোদের ভিতর শাদা পালের অপরিসীম উজ্জ্বলতা মানুষের নয় হৈমন্তীর সূর্যের; মাঝিদের ভিড় — সেখানে বিকেল যেন ঘরানা প্রেতের মত, পেয়ে গেছে নিঃশব্দ নিঃস্পৃহ মানবীয় মাপ হেমন্তের মাঠের বাজারে।"[৪]

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ. ৩৭৩
২। তদেব;পৃ. - ৩৮৫
৩। তদেব;পৃ. - ৩৬২
৪। তদেব;পৃ. - ৩৬৫

অসিত তার কল্পলোকে হেমন্ত নারীর দেখা পেয়েছে, কিন্তু তাকে ভালোবাসতে পারেনি। হেমন্তলোক তাকে যেন কোথায় রেখে দিয়েছে। হেমন্তের জল, বিকেল ও আকাশের নীচে তার মন উদাস হয়ে ওঠে। এ জীবনের, বহমান সৌন্দর্য্যকে ভালোবেসে প্রকৃতি-নারীর তত্ত্বকে অসিত উপলব্ধি করেছে। —

> "আজো চলেছি তো তাই, অথচ কেউ নেই, কিছুই নেই, মানুষও অধঃপতিত। হেমন্তের বিবৃতি বেঁচে রয়েছে শুধু - বিবেক জেগে আছে।"[১]

অসিত লেকের পাড়ে বেড়াতে গিয়ে পাড়াগাঁর জলের কথা স্মরণ করেছে। সে দেখেছে দুটো কাক মেহগিনির মত কালো ডানা মেলে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে, সাদা বক ঘন গাছগুলোকে ধূসরিত করে উড়ে যাচ্ছে। তা উপলব্ধি করেছেন। সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়ে কি গভীর করুণা নিঃসৃত এই পাখি মানুষকে মানবতার পথ দেখাচ্ছে। তবুও মানবতার অহেতুক অন্ধকারের কাছে মানুষ বার বার চাপা পড়ে যাচ্ছে। 'পৃথিবীর কি গভীর গভীরতর অসুখ এখন।' স্ত্রী সীতাকে, অসিত সিনেমায় নামানোর কারচুপি করে। মনোহর সীতাকে কেন টাকা দেয়, তার কৈফিয়ৎ তলব করে। এইভাবে সন্দেহ - অবিশ্বাস - অভাব মানুষকে অপরাধী জীবনের দিকে ঠেলে দেয়। সময়ের অনিঃশেষ প্রবহমানতার ভেতর নাড়ীর যোগ রেখে অসিত সামনের দিকে হাঁটতে থাকে। সীতা মারা যায়, খোকন পাঁচ দিনের জ্বরে মারা যায় — একাকীত্ব জীবনের মুখে ভাড়াটিয়া বিধবা স্ত্রীলোকের আগমন। সবমিলিয়ে অদ্ভুত এক খেলা, যার কোন পরিণতি নেই। হেমন্তের আলোকে অসিত —

> "অসিত কোন চাকরি পেলনা — দেনা জুটল কম — রমেশের অনুমতি নেওয়া দূরে থাক, তাকে না জানিয়ে বাড়িতে ভাড়াটে বসিয়ে হেমন্তের শেষ দিনগুলো কাটিয়ে দিল খেয়ে - না খেয়ে।"[২]

হেমন্ত মানেই অন্তহীন ব্যথা। হেমন্ত মানেই বিষণ্ণতা। হেমন্ত মানেই বৈধ প্রেমের (হেমন্তের দিগুলো) মধ্যে অবৈধ প্রেমের উপস্থিতি - এসব গল্পগুলোতে ভিড় করে এসেছে। 'কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়' গল্পে হিমাংশু অরুণাকে ভালোবেসেছে। একসময় হিমাংশুর মনে হয়েছে, যেক'টি বছর অরুণার সঙ্গে তার কেটেছে - তা অপচয়ের বছর। এই ভালোবাসা তাকে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে পারেনি, বরং ক্ষণিকের এই জিনিসগুলো তার কাছে অবাস্তব মনে হয়েছে। হিমাংশু এখন সরোজিনীকে বিবাহ করেছে। তবুও বিবাহিত জীবনের আগাগোড়াটাকে সে ভালো করে ধরে রাখতে পারেনি। তার কানো বিস্তৃত জ্ঞান-বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা নতুন কোনো অবিসম্বাদী ভালোবাসার অঙ্কুরকে চেপে রাখতে পারে না। সত্তর বছর বয়সেও এক অবশ্যম্ভাবী প্রেম তার জীবনে প্রকাশ পায় কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমানও সন্দেহ, অবিশ্বাস তৈরী হয়। সে জীবনে স্থিরতা ও শীত আসে। তাতে নতুন কিছু প্রকাশ পায়। —

> "পুরনো দিনগুলো মনে করে জীবনটা মাঝে মাঝে নরম হয়ে ওঠে, মধুর পৃথিবী শীতের খেতগুলোর মত, গড়বার সময় যাদের শেষ হয়েছে, বাড়বার সময়, সঞ্চিত মিষ্টত্বকে কুয়াশার ভিতর শুয়ে শুয়ে অনুভব করবার সময় এসেছে যাদের - তারপর কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়।"[৩]

ভালবাসার কুয়াশা নিয়ে এক একটা জীবন কেটে যায়। কখনো কখনো মনে হয় এটাই বুঝি সত্য। তখনি

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ. ৩৬৬

২। তদেব;পৃ. - ৩৭২

৩। তদেব;পৃ. - ১৯

ভেবে দেখলে, আবার চমক লেগে যাবে। এভাবেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে ভালোবাসা এগোয়। জীবন কখন যে কী আবিষ্কার করে, তা কেউ জানে না।

'মেয়ে মানুষদের ঘ্রাণে' গল্পের প্রবোধ জীবনকে নতুনভাবে সর্বদা আবিষ্কার করতে চায়। ইউনিভার্সিটির পর কলেজে দু-চার বছর কাজ করেছে প্রবোধ। তারপর লাইফ ইনসিওরেন্সের এজেন্সি, এখন আসামে ব্যবসায়ের জন্য রওনা দিচ্ছে। লেখকের উক্তি —

> "হয়ত ভালোবাসাও নয়, গৃহের ভিতর স্থিরতা একটা, - সংসর্গ ও সমবেদনার একটা শান্তি, পৃথিবীর শীতের নিস্তব্ধতার ভিতর নক্ষত্র - নরম বনজঙ্গল, ছায়া, শিশিরের শব্দ, পাখির বাসা, দুটো সাদা ডানার নিরীহ নিবিড় গরমের আরাম, এইসব বুকে লেগে রয়েছে প্রবোধের। কিন্তু কে তাকে এইসব দেবে?"[১]

প্রবোধ বিয়ে করেনি। পরিবারের ভাবনা তাকে ভাবতে হয় না। কিন্তু তবুও জীবনটাকে কারা যেন বেঁধে ফেলেছে। গভীর শীতের রাতে বন্দুক হাতে শিকার করতে গিয়ে প্রবোধ দুটো পাখিকে অবাক দৃষ্টিতে দেখেছে। তারা মাটির উপরকার বাসার থেকে সরু সাদা ডানা মেলে সুবোধকে দেখেছে। সুবোধের চমকের অপেক্ষা করছে। —

> "নক্ষত্র নিস্তব্ধতা, টপ্‌টপ্‌ করে শিশির পড়ার শব্দ - শীত, এই সবের ভিতর খড় ঘাস সুতো কুটো আঁশের বিছানার নিবিড় নিরালায় কাকে যেন চমকে দিয়েছে প্রবোধ। দুটো পাখি ..... প্রেমে কোনো বাধা নেই, শান্তির কোনো শেষ নেই। সমস্ত শীতের রাত ভরে পালকে পালক ডুবিয়ে সংসর্গকে বোধ করা - এই এদের।"[২]

'বনলতা সেন' কব্যের 'আমি যদি হতাম' কবিতায় রয়েছে —

> "আমি যদি হতাম বনহংস
> বনহংসী হতে যদি তুমি
> কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
> ধানক্ষেতের কাছে
> ছিপছিপে শরের ভিতর
> এক নিরালা নীড়ে:
> .....
> তোমার পাখনায় আমার পালক, আমার পাখনায় তোমার রক্তের স্পন্দন-"[৩]

ঘুঘু, বনহংস, বনমোরগদের যেমন নীড়, আর প্রবোধের মত মানুষদের গৃহ সকল ভালোবাসা ও সমস্ত শান্তির ঠিকানা। কিন্তু শীতরাত্রির এই রক্ত-স্পন্দন হয়তো প্রবোধের জীবনে কখনো আসবে না। আসামে শীতের রাতে প্রবোধ বসে থেকে থেকে শিশির পড়ার শব্দ অনুভব করে। এই যে দূরে সরে যাওয়া, অপ্রার্থিত, অনাবিষ্কৃত অবস্থাকে সে চায় —

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.- ২০

২। তদেব;পৃ. - ২০

৩। জীবনানন্দ দাশ;বনলতা সেন / সিগনেট প্রেস;কলকাতা - ৭৩ / অষ্টবিংশ সিগনেট সংস্করণ;মাঘ, ১৪১০ / পৃ. - ১৪

"এই শীত ও কুয়াশাকে ভালো লাগে, পৃথিবীর যে কোনো নিকটতম বস্তুর থেকে, সে কি প্রবোধ জানে না, এই যে দূরে সরে যাওয়া, অপ্রার্থিত, অনাবিস্তৃত; এই, এই-ই চায় সে।"[১]

শুধু প্রবোধ নয়, 'আকাঙ্ক্ষা - কামনার বিলাস' গল্পের প্রমথও জানে —

"ভালবাসার পথের পরিপূর্ণ অর্থটুকু কী, বাস্তবিক প্রেম কী-ই যে, এর সূচনা কোথায়, পরিনামই বা কতদূর, কোথায়ই বা ব্যথা তার, তার ঈর্ষা, হিংসা তার, তার শ্লেষ, দৌরাত্ম্য, দুরাচার, মাদকতা ..... তারপর কুয়াশা, তার শীত, তার মৃত্যু।"[২]

প্রায় প্রতিটি গল্পের নায়ক-নায়িকারা শীত ঋতুর পটভূমিতে ব্যর্থতা, ব্যথা ও বেদনা অনুভব করেছে। ভালোবাসার কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে তারা মৃত্যুতেই জীবনের সম্পূর্ণ শান্তি খুঁজেছে। 'আকাঙ্খা-কামনার বিলাস' গল্পে প্রমথ, কল্যাণীকে পেতে চেয়েছে। পাওয়ার স্বাদ উপলব্ধি করেছে বিবাহ সভায়। তারপর থেকে প্রমথের সঙ্গে শুভেন্দুর ঈর্ষা, হিংসাও শ্লেষ শুরু হয়েছে। সবশেষে প্রমথ উল্লসিত। কারণ সে অমৃত লাভ করে শীত ঋতুর প্রতীক রূপ শান্তির অবসাদের মৃত্যুকে আহবান করেছে।

'বিবাহিত জীবন' গল্পে অজিত বিয়ে করেছে সুপ্রভাকে। এর আগে সতীকে সে ভালোবাসতো। অজিত নিজেই নিজের বিবাহ প্রসঙ্গ এনে সতীর মনে আঘাত করতে চেয়েছিল। কিন্তু সতী এতটাই সংযমী যে - এ প্রসঙ্গে তার উপর কোনো প্রভাব পড়েনি। বিবাহিত অজিত মনে করেছে —

"অবিশ্যি নিবিড় প্রেমপ্রবণ আবেগ মিথ্যা নয়, প্রেমও মিথ্যা নয়, কিন্তু তা উপযুক্ত সময়ে এসে উপযুক্ত সময়ে গুল খায়, মাঝের সময়টাকে শীতের বেলার মত অসম্ভব রকমের ছোট করে রাখে প্রায়ই।"[৩]

জীবনানন্দের গল্পের কয়েকটা নারী হল কল্যাণী, অরুণা, অরু, সতী। এরা সবাই নিঃসঙ্গতার ভেতর দিয়ে আগাগোড়া জীবনকে চালনা করতে প্রস্তুত। কিন্তু পুরুষ চত্রিগুলি বড় বেশি সময় ধরে নারীকে কাছে পেতে চেয়েছে। 'বিবাহিত জীবন' গল্পের অজিত বুঝেছে, সে যদি সতীকে বেশিদিন ভালোবাসে, আর পরে সে যখন কারুর স্ত্রী হয়ে জীবন সম্বন্ধে সামগ্রিক চিন্তা করতে শুরু করবে তখন অজিতের কাছে তা বিড়ম্বনার হবে। —

'আজ এ বলবে, 'তোমাকে ছাড়া খুশি হব না।' কালই কিংবা একটা নিকট সময়েও জীবনের শীতের মুখ দিয়ে বলাবে হয়ত 'তোমাকে না ছাড়া খুশি হব না।' আমাদের জীবনের শীত এইরকম। এই ভালই। এই প্রয়োজনীয়।"[৪]

অজিত ও সতী - দুজনেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা হারিয়ে, দাম্পত্যহীন নিঃসঙ্গতার ভেতর দিয়ে সত্য ভালোবাসাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে। — "ভবিষ্যৎ জীবনের শীতের সময় শরতের জ্যোৎস্নার কোনো স্মৃতি নিয়ে নয়, কিন্তু এমনিই, এমনিই সে থাকতে পারত।"[৫]

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.- ২৬
২। তদেব;পৃ. - ৫২
৩। তদেব;পৃ. - ৫৯
৪। তদেব;পৃ. - ৫৯
৫। তদেব;পৃ. - ৬০

'নকলের খেলায়' গল্পে মৃণাল ও দেবব্রতের জীবনকে শীত ঋতু ঘিরে ধরেছে। —

> "মৃণালের পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে দেবব্রত।
> আর একটা শীতের রাত দু'জনের কেটে গেল। কিন্তু জীবন ত দুটো শীতের রাত নিয়ে নয়। হিম-অন্ধকার এ দুটির পাশাপাশি ঘুমের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে জীবন যদি হত! কিংবা অন্ধকার হিম এ দু'টির পাশাপাশি জাগরণের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে।"[১]

জীবনের অনন্ত অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রবলতম প্রয়াস মৃণাল ও দেবব্রতের মধ্যে দেখা গেছে। শীত মানে উল্লাস, মাদকতা, অমৃত, কুয়াশা আর অবশেষে মৃত্যু। তবে মৃত্যুর আগে এই শীত ও অন্ধকারকে যদি তারা অনন্তকাল ধরে রাখত, যদি পরস্পরের এই বিচ্ছিন্নতাকে মনে রাখত — তাহলে তারা হয়তো এই মানবজীবনের, বিধাতার আর একটা অবিচার ভেবে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতো। কারণ কালস্রোতে তো সবই ভেসে যাবে এটাই নিয়ম। —

> "আজকের এই রাতটা, এই গভীর শীতের ভেতর, মৃণালকে নিয়ে ওর অন্ধ আবেগের এই ভালোবাসা কাল হয়ত জ্ঞানের ঘৃণায় দাঁড়াবে গিয়ে ..... শীতের ভিতর পরস্পরকে লিপ্ত করে এই উষ্ণতা ও শান্তি যদি অনাদি শান্তি ও উষ্ণতা হত ..... তাহলে কার ক্ষতি হত? কিংবা ক্ষতি হত হয়ত ....."[২]

গভীর শীত ও গভীর অন্ধকার — দুইই প্রেমিক-প্রেমিকাকে বিচ্ছিন্ন করে মৃত্যুর পরপারে নিয়ে যায়। যেখানে নিরর্থকতার ভিতর কোনো নীড় নির্মিত হয় না। সেখানে থাকে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিস্তব্ধতা। 'মা হবার কোনো সাধ' গল্পে শেফালী ও প্রমথের জীবনের মানে হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু অধীনতা ও অপমান। তারা মনে করে দুঃখময় পৃথিবীতে তাদের কোনো বিধাতা নেই, বিশ্বাস নেই, স্বর্গ নেই। শেফালী চায় তার সমস্ত রকম অধীনতা ও যন্ত্রনা থেকে উদ্ধার করে সাংসারিক সম্পদ, সাংসারিক মুক্তি, সাংসারিক প্রসন্নতা ও শান্তি দিক প্রমথ। কিন্তু তা আর হয়ে উঠে না।

> "আগামী শীতেও কিছু হবে না। তার পরের শীতেও না। তারপরই বা কি হতে পারে? জীবন শীতের থেকে শীতের প্রদেশে চলতে পারে শুধু। জীবন জীর্ণ হবে, অপরিচ্ছন্ন হবে, রক্তাক্ত শীতাক্ত হয়ে পড়বে শুধু, পৃথিবীর কাছে অপ্রয়োজনীয়ের থেকে অপ্রয়োজনীয়তর হয়ে চলবে।"[৩]

মানুষ দুঃখকে ভুলতে চায়। আর পেতে চায় শান্তি। 'শুধু সাধ, শুধু রক্ত, শুধু ভালোবাসা' গল্পের সত্যব্রত, সাধনাকে বিয়ে করে সুখী হতে চেয়েছিল। বোন মাধুরীর জন্য ছিল তার অগাধ চিন্তা ও আগ্রহ। সে যাই হোক, সাধনার সঙ্গে বোনের কথোপকথন বা সাধনার সঙ্গে সত্যব্রতের উক্তি-প্রত্যুক্তি সত্যব্রতকে মৃত জ্যোৎস্নার অন্ধকারের মতো কষ্ট দিয়েছে। প্রেম যা আনন্দের হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত যাতনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে মাধুরীর সঙ্গে শীতাংশুর প্রেম, যা ভয়াবহ, বিষম, অন্ধ। তাই এ সবকিছু থেকে সত্যব্রত নিস্তার পেতে চেয়েছে —

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.- ৬৫
২। তদেব;পৃ. - ৬৯
৩। তদেব;পৃ. - ৭৮

"হেমন্তের নিরবচ্ছিন্ন জ্যোৎস্নায়, কুয়াশায়, নিস্তব্ধতায়, নিজের প্রেমাস্পদশূন্য জীবনটাকে পরম স্পৃহা ও শান্তির সঙ্গে অনুভব করছে সে।"[১]

'মা হবার কোনো সাধ' গল্পের প্রমথের মতো, 'প্রেমিক স্বামী' গল্পের প্রভাত, স্ত্রী মলিনাকে শান্তি দিতে চায়। কিন্তু সেই শীতের শীতাক্ততার ভেতর প্রভাতের অকর্মন্যতা প্রকাশ পেয়েছে। যে শীতের রাতে পৃথিবীর পাখি, ফড়িং, কীট, একটা পরম পরিতৃপ্তি পায়, সেই শীত-রাত্রিতে মলিনা নামক মেয়েটি কি পেয়েছে, —

"শীত রাতের গভীরতার ভিতর স্বামীকে ভালোবাসা দূরে থাক, এই কোনো রক্তমাংস কোনো 'অন্তরাত্মা' কোনো কিছুর জন্য কোনো কামনা থাকে না মলিনার। জীবনে ঘুম ছাড়া তখন আর কিছু নেই। ঘুম ছাড়া, মৃত্যু ছাড়া।"[২]

শীতের শেষে বসন্তের আগমন। মাঘ মাসের শেষ দিনগুলোর মধ্যে বসন্তের বাতাস বইতে থাকে। 'পাতা-তরঙ্গের বাজনা' গল্পে পাতাগুলো সমস্ত সকাল, সমস্ত দুপুর ধরে বেজে চলে। দেবেন, মালতীকে হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ে। প্রকৃতির গভীর একাগ্র ঢেউয়ের নিস্তব্ধতা এসে তাকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। নতুন বছরের প্রথম পাতাগুলো যখন গাছের ডালপালাগুলোকে ঝাঁকে ঝাঁকে ভর্তি করে দিয়েছে তখন দেবেনের মন হয়ে যায় শূন্য। তার মনে হতে থাকে —

"মাঘের শেষ দিনগুলো চলছে। তবুও মাঝে মাঝে বসন্তের বাতাস দিচ্ছে ..... জীবন যদি এসব ভুলে শুধু পাতা - তরঙ্গের বাজনার মত বাজতে পারত, গুর্‌গুর্‌ .... গুর্‌গুর্‌ দিন রাত, রাত দিন, কিন্তু মানুষের জীবন তা পারে না। দুধ ডিম ইমালশন মদ .... সমস্ত বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষাকাল কদর্য লালসায় কেটে গেল, কদর্য লালসা? কদর্য নয় কি?"[৩]

দেবেন জানে জীবনটা জায়গায় জায়গায় সুন্দর, আবার সময় সময় অন্ধকারের ভেতর দারুণ ভয়াবহ হয়ে ওঠে। সে নিজের মধ্যে কুৎসিত রূপ দেখতে পেয়েছে। প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে তবু দেবেনের মনের কোনে হাস্যকর, বীভৎস, অসংলগ্ন চিত্র লেগে রয়েছে।

'আর্টের অত্যাচার' গল্পে নিখিল জগৎকে শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে দেখেছে। দরিদ্র, সাধারণ মন তাকে আর্টিস্ট হতে সাহায্য করেছে। নকূলে থাকতেই সে কবিতা পড়া শুরু করেছে। সাহিত্য আরম্ভ করেছে। তার মনে হয় সাহিত্য এমন এক বিষয়, যা মানুষকে ভিড় থেকে টেনে আনে - তারপর ছবি দেখতে বলে - তারপর ছবি আঁকতে বলে। নিখিল কতগুলো এলোমেলো শব্দ, একটা দুঃসাধ্য চিন্তা নিয়ে জীবনকে অসহ্যময় করে তোলে না। সে জানে সহজ চিন্তাতেই আছে নিবিড় শান্তি, পরম আনন্দ। এই যেমন পুরনো বোর্ডিঙে সময় কাটানো কিংবা মার্চেন্ট অফিসে কোনো কাজ নেওয়া কিংবা কেরানি হওয়াতে নিস্তব্ধ

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.- ৯৩

২। তদেব;পৃ. - ১০০

৩। তদেব;পৃ. - ১১৪

সান্ত্বনা আসে। তার আর্টিস্ট মনের ভাবনা —

> "শীতের দিনগুলো কেটে যাচ্ছে।
> একটা মস্ত বড় ঝাউগাছের শাখার পিছনে চাঁদ রোজ সন্ধ্যার সময়ই
> আসছে। শীত আর নেই।
> চাঁদ এখনো আছে। আরো অনেকটা দিন থাকবে। এই জ্যোৎস্নায়, এই
> বসন্তে শরীরটাকে এত ভালো লাগে হৃদয়টাকেও।"[১]

আর্টিস্টের জীবনের আকাঙ্খা, অবসাদ ও সান্ত্বনার কথা 'বিস্ময়' গল্পে লেখক আমাদের শুনিয়েছেন। সুবোধ, সতীকে কাছে পেলে আনমনা হয়ে ওঠে। প্রেমে নিবিড় হয়ে গভীরভাবে সুবোধ সতীর সুন্দর হৃদয়ের সান্ত্বনাকে উপলব্ধি করে। কিন্তু আর্টিস্টের জীবন যে নিষ্ফল তাই সতীর স্বামী তারাপদ যখন সেখানে এসে পড়ে, তখন সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে যায়। রুমে ফিরে সুবোধ চুরুট ধরায়। কিন্তু তাও শীতের ভেতর ধীরে ধীরে নিভে যায়। শীতের নিস্তব্ধ আচ্ছন্নতা, একটা বেদনাবিধুর আবেশ, একটা দীর্ঘ রেখায়িত প্রশ্ন, একটা বিস্ময় নিয়ে সুবোধের দিন কাটতে থাকে। একদিন সন্ধ্যায় সুবোধ অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে থাকে। সে জানে না, তার সামনে কয়েকজন লোক খাটিয়ায় করে মড়া নিয়ে চলেছে। সে তাদের সঙ্গেই হাঁটতে থাকে। যখন সে থামল, মড়ার খাটিয়ার পাশেই এসে থামল। —

> "বসন্তের বাতাস দিচ্ছে। ..... মন একটু বিশ্রাম নিচ্ছে শুধু। জ্যোৎস্নায়,
> বসন্তের হাওয়ায়, নদীর গন্ধের কাছে উন্মোচিত জীবনের নতুন উন্মোচিত
> আশ্চর্য আস্বাদের ভিতর।"[২]

সে জানল, সতী মারা গেছে। এই পীড়ার আঘাতে সুবোধের হৃদয়ের রক্ত টঙ্কার দিয়ে উঠল। কেমন একটা নিষ্ফলতা এই বসন্তের বাতাসের মধ্যে তাকে ঘিরে ধরেছে। তার কাছে এ যেন শুধু আর্টের নিষ্ফলতাই নয়, আরো অন্য কিছু।

'বত্রিশ বছর পরে' গল্পে জীবনানন্দ অসহায় মানুষদের জীবনের ছবি ঋতুর আলোকে এঁকেছেন। জানিয়েছেন —

> "বছরের ভিতর এরকম অবসর ও বিলাস স্বর্ণ ও টুকুনের জীবনে কয়েক
> দিনের জন্য আসে শুধু। সারাটা বছর এরা গরমে মরে, শীতে কাঁপে,
> হয়ত বর্ষায়ও ভিজেছে"[৩]

অভয় যখন কলকাতায় বসে থেকে প্রাইভেট টুইশনের টাকার উদ্বৃত্ত থেকে চুরুট ফুঁকছে, তখন তার স্ত্রী স্বর্ণ ও কন্যা টুকুন গরমের মধ্যে মশার কামড় খাচ্ছে। অভাবী জীবনের নিঃসঙ্গতা স্বর্ণকে ঘিরে ধরেছে। শুধু বাতাসের জন্য একটু আকাঙ্খা স্বর্ণের। অর্থাৎ মুক্ত জীবন আকাঙ্খা করেছে সে।

জীবনানন্দের লেখায় গ্রীষ্ম ঋতু সুন্দর হয়ে উঠেছে। 'হাতের তল' গল্পে প্রমথ উপলব্ধি করেছে —

> "জাম কাঁটাল শিরীষের ভিতর থেকে উপচে পড়ে দুপুরের বাতাসের
> আর শেষ নেই, বৈশাখের বাতাস এমন নীল, কৃষ্ণচূড়ার গাছে হঠাৎ
> ফুল ধরে গেছে, বোলতা প্রজাপতি মুনিয়া টুনটুনির কি সব নরম শব্দ
> চারদিকে। কিন্তু এসবের দিকে বেশিক্ষণ মন থাকে না।"[৪]

প্রমথ জানে রোমান্টিকতা নয়, দু'মুঠো খাদ্যের সংস্থান করাই জীবনের বাস্তব মধুরতা। তাই সে ভাবে ৮০ টাকার কেরানিগিরিতে যদি বহাল হয়ে যেত, তাহলে রবিবারের গ্রীষ্মকালের দুপুরটা তার কাছে কত সত্য

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.-১২৬
২। তদেব;পৃ. - ১৪৪
৩। তদেব;পৃ. - ১৪৭
৪। তদেব;পৃ. - ১৫২

মনে হত।

'সাত কোশের পথ' গল্পের প্রবোধ বুঝেছে, তুচ্ছ জিনিসই জীবনে স্থিরতা আনে। ধৈর্য্য ও প্রতীক্ষা দিয়ে শান্তিকে পেতে হয়। অন্ধকার, কুয়াশা, জোনাকি, কুমড়ো শশার লতা, ক্ষীর গাছ একটা একাকীত্ব নিস্তব্ধতা -এসব নিয়েই তার জীবন। প্রবোধকে মালতী কিছুতেই ছাড়ে না। সমস্ত পৃথিবীর রূপকে এ মেয়েটি যেন কাদা-কৃমি করে দিয়েছে। সেকারণে প্রবোধ শীতের মধ্যে প্রিয়স্পর্শ পায় না। তার জীবনে আজ বর্ষার সে মানে নেই। —

> "বর্ষা বা শীতকে ঊষার মত মেয়েরা এত ভালোবাসে কেন? প্রবোধও ত এখন শীতবোধ করছে, গরমের ভিতর যে শীতবোধ পাওয়ার জন্য লোক সিমলা যায়, আলমোড়া কুমায়ুন ঘুরতে যায়, কিংবা (কিন্তু) এই শীতের ভিতর কোনো প্রিয় স্পর্শইতো সে বোধ করে না।"[১]

প্রবোধ জানে তার জীবনের রাতের স্বপ্নগুলো কতো স্পষ্ট। গরমের রাতগুলোকে তার খুব ভালো লাগে। বর্ষার সঙ্গে তার নিস্তব্ধতার সম্পর্ক। সমস্ত আবর্জনাময় ঘরের দিকে তাকিয়ে তার দৃষ্টি থেমে যায়। কিন্তু একসময় এই বর্ষা তার কাছে রোমাঞ্চ কর ছিল। আসলে জীবন পরিবর্তনশীল। —

> "এই বর্ষাকে কতদিন কত জায়গায় তার ভালো লেগেছে, এমন গভীর রাতে যখন সে এসেছে প্রবোধকে কতবার জেগে জেগে রোমাঞ্চ বোধ করতে হয়েছে। আজ জীবনে বর্ষার সে মানে নেই।"[২]

আর্টিস্ট সাংসারিক স্বচ্ছলতা নিয়ে একাই থাকে। তার শিল্পীপ্রাণ নিঃসঙ্গ। 'ক্ষণিকের মুক্তি দেয় ভরিয়া' গল্পে বিরাজ একজন আর্টিস্ট। তার স্ত্রী কমলা। এদের দুজনের মধ্যে দুরত্ব অনেকখানি। কারণ বিরাজ কি লেখে, কি লিখতে চায়, কী পড়ে, কী পড়তে চায়, — এসব নিয়ে কমলার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। আসলে বিরাজের লেখাপড়া কমলার কাছে সবসময়ই অন্ধকার জিনিস। কেমন যেন অসংলগ্ন। বিয়ের চার পাঁচ বছর পরেও এরা কেউই কাউকে ডেকে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করে না। এদের জীবন-যাপনের ছবি দেখে জীবনানন্দ হেমন্তের কথা মনে করেছেন। বলেছেন —

> "জীবন কোন এক হেমন্তের স্থিরতায় পৌঁচেছে যেন, জীবনের হেমন্তের ঢের আগে।
> এরা পরস্পরের থেকে এমনই আন্তরিকভাবে বিচ্ছিন্ন আজ।"[৩]

হেমন্তের এই নিঃসঙ্গতা, একাকীত্বকে সরিয়ে বিরাজ যেন 'শীতের দেশে মাঠের ভিতর শাদা ছোট একটা বাংলোয়'[৪] চলে যেতে চায়। কলকাতার কোনো মেসের একটা নিরিবিলি কামরায়। শেষে উপলব্ধি হয় বিয়ে করা আর্টিস্টের পক্ষে মারাত্মক। "জীবনে হেমন্তের অভিসঞ্চার প্রকৃতির মতোই এক পরিব্যাপ্ত নিয়মের ফল, এ যেমন কবি এখানে বুঝেছেন, তেমনিই অন্যত্র অনুভব করেছেন। প্রকৃতিতে হেমন্তের

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.-১৮৮
২। তদেব;পৃ. - ১৮৮
৩। তদেব;পৃ. - ১৯৫
৪। তদেব;পৃ. - ১৯৫
৫। অম্বুজ বসু : একটি নক্ষত্র আসে / পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯ / চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন, ১৪১১ , পৃ. - ১১০

আর্বিভাবের মতো আমাদের হৃদয়েও হেমন্তের আস্বাদ পাওয়া যায় কখনো কখনো;"[৫]

'বাসররাত' গল্পে প্রেমনীহারের ব্যথাময় জীবনের ছবি রয়েছে। সে মণিকাকে বিয়ে করেছে। মণিকা তারই - এই একটা গভীর পরিতৃপ্তিতে প্রেমনীহারের মন ভরে উঠেছে। জীবনের এক একটা আশ্চর্য ধাপ - যা শুধুমাত্র নিষ্ফলতা, কল্পনা, কামনা নিয়েই ব্যথাময় নয়, যা আড়ম্বরপূর্ণ। উৎফুল্লময়। এখানে প্রেমনীহারের জীবনে মণিকার আগমন, গন্ধ ও বিলাস বিজড়িত হয়েছে। লেখকের বর্ণনায় —

"বাসর ভাসিয়ে মাঘের জ্যোৎস্না।
শীত তেমন একটা নেই আর। বরং বসন্তেরই হাওয়া দিচ্ছে।
প্রেমনীহার বাসরশয্যার ওপর অনেকক্ষণ ধরে শুয়ে আছে।
পাশেই বিবাহ রাতের নানারকম অবর্ণনীয় গন্ধ ও বিলাস বিজড়িত
বধূ....."[১]

শীত আর বসন্ত অর্থাৎ ব্যথা ও ব্যথাভরা আনন্দ প্রেমনীহারের জীবনে রয়েছে। গভীর শীতের রাতে প্রেমনীহার মণিকার দেহকে শাল দিয়ে ঢাকার চেষ্টায় রত। কিন্তু মেয়েটি তা গ্রহণ করতে অপ্রস্তুত। বাসরঘর ছেড়ে সে পালিয়ে যায়। কারণ তার মনের আশা আজ অপূর্ণ। সে ভেবেছিল - "ফিট একখানা চারতালা শাদা বাড়ি হবে গাড়ি বারান্দা-ফারান্দা কত কি?"[২]

কিন্তু তা নেই। আশাভঙ্গের ব্যথায় ব্যথাহত মাণিক, প্রেমনীহারকে আঘাত দেয়। প্রেমনীহার নিস্তব্ধতার ভেতর গভীর আরাম করে ভাবতে থাকে তার যেন বিয়ে হয়নি। কোনো বধূ যেন তার জীবনে নেই। সে অনাকাঙ্খিত এক যুবক হয়ে থাকতে চায়। শীতরাতের শুষ্কতায় প্রেমনীহারের মন ডুবে যায়। শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। —

"সন্ধ্যার বাতাসে ঝাউ গাছটা ঝির্‌ঝির্‌ করছে। অনেকগুলো তারা
উঠেছে আকাশে। ফাল্গুনের মাঝামাঝি কেমন একটা শীতের কাঁটা
দিচ্ছে আবার। প্রেমনীহার তার বালাপোষটা টেনে নিল।"[৩]

মণিকা নয়, ব্যথাভরা আনন্দে বালাপোষটাই প্রেমনীহারের সঙ্গী হয়েছে।

'মেয়েমানুষ' গল্পটি শুরু হয়েছে গ্রীষ্ম ঋতু দিয়ে, আর শেষ বর্ষা ঋতু দিয়ে। গ্রীষ্মের দাবদাহ আর বর্ষার প্রশান্তি গল্পের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে। হেমেন ও চপলা, দ্বিজেন ও নীলা - এই দুটি সম্পর্কের প্রেম-প্রণয় এখানে প্রকাশিত। গল্পের শুরুতে রয়েছে —

"বৈশাখের দুপুরবেলা।
চপলা আধ ঘন্টা না ঘুমোতেই জেগে গেল। জানালার ফাঁক দিয়ে
কৃষ্ণচূড়া গাছগুলোতে দেখা যায় ফুল ঝরছে।
পাশের রুমে কড়া চুরুটের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। - স্বামী অফিস থেকে
ফিরে এসেছে তা হলে?"[৪]

চপলার বয়স ৪০ পেরিয়ে গেছে - হেমেনের ৪৯। দু'জনের শরীর মোটা হয়ে চলেছে। মাথার চুল পাতলা

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.-২৫১
২। তদেব;পৃ. - ২৫৪
৩। তদেব;পৃ. - ২৫৯
৪। তদেব;পৃ. - ২৯৫

হয়ে আসছে। প্রচণ্ড গরমে দ্বিজেন ও নীলার সঙ্গে এরাও বেড়াতে যেতে চায়। তবে দ্বিজেন জে-বি-এ্যাণ্ড - কোং কোম্পানি খুলেছে। সারাদিন বিজনেস নিয়ে ব্যস্ত। দ্বিজেনের সঙ্গে পড়ে হেমেনও বিজনেস নিয়ে মেতে ওঠে। বাদল রাতে হেমেন প্রকৃতির দিকে পরম আরামে ও নিবিড় শ্রদ্ধায় তাকিয়ে বসে থাকে। আজকের রাত হেমেনকে এই আশা দিয়েছে যে, সমস্ত পৃথিবী অসীম অর্থে ভরা। হেমেনের ভাব-ভাবনা সম্বন্ধে লেখকের উক্তি —

> "হেমেন আকাশটার দিকে তাকাল। আতার বিচির মত অন্ধকারে
> সমস্ত কলকাতায় আকাশটা গেছে ভরে; মেঘের অন্ধকার - টিপ্-টিপ্
> করে বৃষ্টি পড়ছিল। তার এখন ভাল লাগল। চপলার কথা মনে হল।
> .... আজ সমস্ত রাত চপলাকে ভালবাসবে। সে আজ সমস্ত বাদলের
> রাত ভরে এমন একটা অপরিসীম শান্তি পাবে।"[১]

হেমেন কিন্তু তখনই চপলার কাছে যায় না। বাদল রাতে, গাড়ি নিয়ে, মনের আনন্দে, দ্বিজেনের সঙ্গে টালিগঞ্জ, আলিপুর, চেতলা, বেহালা ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে। দ্বিজেন চপলার কাছে যায়। ভলোবাসার বিনিময় করে। পাগল হেমেনরা এভাবে বাদলের রাতকে উপভোগ করতে গিয়ে মেতে ওঠে।

'হৃদয়হীন গল্প' তে অমরেশ বাদল রাত নিয়ে নয়, শরতের শিশির তিমিরাহত রাতে নীলিমাকে কাছে পেতে চায়। —

> "এই সন্ধ্যার অন্ধকারে সমস্ত এই শরতের কমনীয় শিশির তিমিরাহত
> রাতভরে অমরেশের কাছে সে থাকুক, তার গল্প বেঁচে থাকুক, সেই
> পরাঙ্মুখ মেয়েটি সমস্ত হৃদয়হীন গল্প তার।"[২]

অমরেশের স্ত্রী নীলিমা দালানের দক্ষিণের দিকের একখানা খোলামেলা কোঠায় থাকে। তার চোখের সামনে দশ-বিশটা ধানের খেত ভেসে হাওয়া আসে। যেন পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে এই ক্ষেতগুলো —

> "বাদল কেটে গেছে, চোখ তুললেই আকাশের নীলিমাকে যেন
> পৃথিবীর সীমাপর্যন্ত অনুসরণ করতে পারে নীলিমা। শরতের আলো
> রোদ ..... শেফালি গাছ .....মাছরাঙা ও বকের পাখায় তখন
> ঝিক্‌মিক্ করছে আকাশটা।"[৩]

নীলিমার কাছে শরতের রূপ খুবই কৌতূহলের জিনিস। তবে অমরেশের কাছে কখনো কখনো এসব একঘেঁয়ে মনে হয়। আসলে সে শরতের ধানখেতের দৃশ্যের সঙ্গে কোনো মেয়েমানুষ বা পুরুষকে কাছে পেতে চায়। নীলিমাকে অবিশ্যি পেলে তার খুব ভালো হয় —

> "শরতের এই আকাশ বাতাস পৃথিবী বেশ সুন্দর বটে কিন্তু দিনরাত
> এই একঘেঁয়ে দৃশ্য তার ভালো লাগে না। ....
> কি চায় সে? একজন মেয়েমানুষ ...."[৪]

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.-৩০৪

২। তদেব;পৃ. - ৩৫০

৩। তদেব;পৃ. - ৩৪২

৪। তদেব;পৃ. - ৩৪৫

অমরেশ চায় নীলিমাকেই। সে আসুক। তার সঙ্গে দুদণ্ড সময় কাটাক।

'বিবাহ অবিবাহ' গল্পে অমূল্য চায় সরযূকে। কিন্তু সরযূ সংসারের কাজে এতখানি ব্যস্ত থাকে যে, স্বামীকে প্রফুল্ল প্রসন্ন সঙ্গ অনেকক্ষণ ধরে দিতে পারে না। অমূল্য জানলার ভেতর দিয়ে কার্তিকের ধানের ক্ষেত দেখে সময় কাটায়। হেমন্তের দুপুরে সমস্ত পাখি পাখালি ফড়িং কীট তাদের খেয়াল ও উৎসাহ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকে। অনেক উঁচুতে একপাল বক শো শো করে উড়তে থাকে। কিন্তু অমূল্যের জীবন হেমন্তের অসারতায় ভরা —

> "পাতা হলুদ হচ্ছে, প্রকৃতি মরে যাচ্ছে। ... মুমূর্ষু প্রকৃতি মৃত্যুর ভেতর দিয়ে যেন নবজীবনের পুনরুত্থানের জন্য প্রতীক্ষা করছে। যেন সেই সমাহিত সুপ্ত মুখের ভেতর লেগে রয়েছে তাদের এই হেমন্তের স্পৃহমান গাছপালা পাতা ঘাস। ... তবে হেমন্তের অসারতা যদি কারু জীবনে এসে ছুঁয়ে থাকে তো যেন অমূল্যরই।"[১]

তবু হেমন্তের হিমভরা রাতে সরযূকে কাছে পাওয়ার আশা ছাড়ে না অমুল্য। রাতের খাওয়ার শেষে অমূল্য কৃষ্ণনবমীর চাঁদের সৌন্দর্য্য, দূরে বনমোরগের শব্দ, লক্ষ্মী-পেঁচার ডাক, নিমগাছের পাতা কাঁপিয়ে শিশির ঝরার শব্দ অনুভব করতে থাকে। আর অপেক্ষা করতে থাকে সরযূর জন্য —

> "অনেক রাত হয়ে গেছে এখন। মাঠের ঘাসে কাশের নিরবচ্ছিন্নতায় হেমন্তের হিমে কুয়াশায় ধান জ্যোৎস্নার লাবণ্যে মন এমন স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।
> সরযূ এখনো ঘরে আসে নি।
> আর একটু জেগে অপেক্ষা করছে অমূল্য।"[২]

সরযূ আসে না। একঘেঁয়ে ভারহীন, অনুভূতহীন প্রেম নিয়ে অমূল্যকে জীবন যন্ত্রনা পেতে হয়। রাতের নীরবতায়, নিবিড়তায়, হিমাচ্ছন্নতায় মানুষের আশা ও অবাস্তবতার জগৎ নিয়ে অমূল্য ভাবতে শুরু করে। সরযূ হয়তো অন্যকাউকে এই রাতের নির্জনতায় চায়। তার চুড়ির রিন্ ঝিন্ শব্দ আর শোনা যায় না। শুধু শোনা যায় শিশির ঝরার শব্দ।

> "হেমন্তের নিরবচ্ছিন্ন মাধুরী ও মোহের পৃথিবী। কিন্তু সে পৃথিবী নিয়ে অমূল্য অনেকক্ষণ বসতে জানে না। .... সে নদী ধান জোনাকি হিমের নিশ্চলতার ভেতর মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে যেন।"[৩]

হেমন্তের হিমরাতে একা একা অমূল্যর ভালো লাগে না। নভেলটা ধীরে ধীরে পড়তে পড়তে সিগারেট ধরায়। পাশে মায়ের কোঠা। শোনা যায় মায়ের নিঃশ্বাসের শব্দ। অমূল্যর ব্যথাহত জীবনে ছোটবেলার স্মৃতি ভেসে আসে।

> "ঘুমন্ত মা। মায়ের নিঃশ্বাস। সমস্তটা হেমন্তের শীতের রাত ধরে সেই কবেকার ছোটবেলার সেই মায়ের এমন নিকটতম সান্নিধ্য .... আনো

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.-৩৫১
২। তদেব;পৃ. - ৩৫৩
৩। তদেব;পৃ. - ৩৫৪
৪। তদেব;পৃ. - ৩৫৫

বিধাতা? অমুল্য মনে হয়। সে যেন কোন স্বর্গে চলে গেছে।"[৪]

এখানে অমূল্যের মন প্রেম-কামনা থেকে উঠে এসে মাতৃস্নেহের পরম আরামে ও নীরব শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর ভেবেছে কেউ কারুর স্ত্রী নয়, কেউ কারুর স্বামী নয়, পৃথিবীতে স্নেহ ভালোবাসার কোনো প্রয়োজন নেই। জীবনে একটা দীর্ঘ রাত থাকুক শুধু। সেই রাতের ঘুম যেন আর না ভাঙে। বিধাতার ঘুম যেন আর না ভাঙে। অমূল্য শেষ পর্যন্ত অপ্রাপ্তিকে মাথায় নিয়ে দার্শনিক হয়ে উঠেন। "মানুষের চেতনায় একই ঋতু নানা সময়ে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া আনতে পারে। কবির কাছে সুপক্ক যবের ঘ্রাণমাখা হেমন্ত যখন জীবন বোধে উদ্বুদ্ধ করেছে চিত্তকে তখন অন্য কেউ যে এই পরিবেশকেই অসহনীয় মনে করে মৃত্যুকামনা করতে সক্রিয় হবে - এটা বিস্ময়কর; কিন্তু এটাও সত্য। এখানেই জীবনের রহস্য।"[১]

অরুণা ও বিনোদের মধ্যে কোন এক সময় প্রেম তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সে প্রেম সার্থক হয়নি, কিংবা স্পষ্ট রূপ নেয়নি কখনো। এই প্রেম কুয়াশার মত অস্পষ্ট থেকে গেছে তাদের জীবনে। তাই অরুণার বিয়েতে স্বাভাবিক ভাবেই উপস্থিত হতে পেরেছে বিনোদ। কোনরকম আঘাত লাগেনি বিনোদের মনে। 'কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়' গল্পের এই অস্পষ্ট প্রেমকে জীবনানন্দ শীত ঋতু ও কুয়াশার উপমায় তুলে ধরেছেন।

শীতঋতুর পটভূমিতে 'মেয়ে মানুষদের ঘ্রাণে' গল্পটির কাহিনী নির্মাণ করেছেন জীবনানন্দ। শীতের পৃথিবীকে প্রবোধের মনে হয় অলীক মমতাময়ী। মনের তৃপ্তিকে শারীরিক করে তুলেছেন জীবনানন্দ এই গল্পে। তাই তিনি বলেছেন, "ভিজে ভিজে ঘাসে খোঁপা খসে, ছড়িয়ে, মেয়েমানুষদের ঘ্রাণে সমস্ত পৃথিবীটাকে ভরে ফেলে জীবনের সমস্ত উষ্ণতাকে সে যেন স্নিগ্ধ করে ফেলছে।" প্রবোধ একজন ব্যবসায়ী লোক। তবু সে চলার পথের শেষ দেখতে চায় না। শীত ও কুয়াশাকে তার খুব ভালো লাগে।

বিয়ের পর হেমের রূপ মলিন হয়েছে। হেমন্তের কুয়াশায় মিশে তার রূপ যেন প্রেতনির আকার নিয়েছে। হেম তার শরীরকে 'মাংস' নামের কুশ্রীতা দিয়ে অভিহিত করেছে। সে মনে করে আজকাল তাকে মাকড়শার পায়ের মতো কিংবা কৃমির মতো দেখায়। স্বামী-স্ত্রীর জীবন হেমের কাছে অনেকটা ভোজবাজির মত। তার চেয়ে অঘ্রাণের প্রকৃতি তার কাছে অনেক নরম ও মধুর লাগে। পৃথিবীর অঘ্রাণ যেন তার জীবনের ভিতরের অঘ্রাণ। 'মাংসের ক্লান্তি' গল্পটিতে শরীর চর্চা করেছে হেম। হেমন্তের হিমেল, কুয়াশাময় প্রকৃতির কথা বলেছেন লেখক হেমের চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে।

'উপেক্ষার শীত' গল্পে অরু কাউকেই ভালোবাসেনি, তবু শেষপর্যন্ত অরু বিয়ে হওয়ার পর শরদিন্দুর প্রতি প্রেম বিরহ অনুভব করেছে। শীতকে উপেক্ষা করেছে শরদিন্দু। প্রেমের সঠিক মানে খুঁজতে গিয়ে মনের শীতকে উপেক্ষা করতে চেয়েছে শরদিন্দু। 'আকাঙ্ক্ষার - কামনার বিলাস' গল্পে জীবনানন্দ দাম্পত্য জীবনের সমস্যাকে পরিস্ফুট করতে শীতঋতুকে গ্রহণ করেছেন। কল্যাণী ও প্রমথের দাম্পত্য জীবনের মাঝখানে শুভেন্দু এসে উঁকি দিয়েছে। এদের দাম্পত্য সমস্যাকে পরিস্ফুট করতে লেখক শুধু শীত নয়, কুয়াশাকেও উপস্থিতি করেছেন। সুপ্রভার নারী সৌন্দর্য্য অজিতকে স্পর্শ করে না। কারণ সতী অজিতকে ভালোবাসে, কামনাও করে, আবার তাকে কাছে না পেয়ে অতৃপ্তি বোধও করে। তবু দেখা যায় অজিত প্রায় পরিতৃপ্তির আনন্দে সতীকে যেন চায় না। অজিতের এমন ধরণের প্রেমের অনুভূতিকে লেখক শীতের সময় দিয়ে বিবৃত করেছেন।

১। অম্বুজ বসু : একটি নক্ষত্র আসে / পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯ / চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন, ১৪১১ , পৃ. - ১১০

'নকলের খেলায়' গল্পে মৃণালের পাশে ঘুমিয়েছে দেবব্রত। কিন্তু তাদের মাঝে রয়েছে শীতের অন্ধকার ও ঘুমের অন্তহীন উপস্থিতি। এগল্পে লেখক বলেছেন, জীবন রুচি অনুসারে চলে না, প্রয়োজন অনুসারে চলে না, খেয়ালের নিয়মে চলে। অব্যর্থ নিয়মের খেয়ালে নরনারী খণ্ডাংশের অভিনয় করে মাত্র। দেবব্রত অঘ্রাণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুনের — সময়গুলিতে মৃণালকে দেবব্রত সরিয়ে দিতে চেয়েছে। কারণ দেবব্রত ফূর্তি চায় না। অনাদি শান্তি ও উষ্ণতায় দেবব্রত মৃণালের সঙ্গে শীতের ভিতর গরমের সঙ্গে লিপ্ত হতে চায়।

প্রমথের পক্ষে সংযমী জীবন যাপন করা অত্যন্ত কঠিন। শেফালী ও প্রমথ জীবনের এত পাশাপাশি থেকেও নানারকম অসাধ, অনিচ্ছা ও অমর্যাদার ভিতর দিয়ে সময় কাটিয়েছে। তিক্ত মধুর জীবনের মাঝখানে উপস্থিত হয়েছে শীতঋতু।

'শুধু সাধ, শুধু রক্ত, শুধু ভালবাসা' গল্পে লেখক লক্ষ্য করেছেন সত্যব্রত ও তার বোন মাধুরীর জীবনে শীতের স্থিরতা রয়েছে। সত্যব্রত অনুভব করার চেষ্টা করে মাধুরীর মধ্যে কোন প্রেম প্রবনতা রয়েছে কিনা? যদি থাকে তাহলে তার ভালবাসার ব্যক্তি কে - বিনয়েশ না অসিত? আশ্বিনের রোদ, ধানের ক্ষেত, শীত, কার্ত্তিকের আকাশ, শিশিরে পিছল ধানের শিস, কুয়াশার ছবি — এসব সত্যব্রতকে এক নিরুদ্দেশের পথে টেনে নিয়ে যায়। অনুপমার রূপ, প্রেম সত্যব্রতের জন্য একদিন ছিল। কিন্তু সত্যব্রত তার জীবনে প্রেম নিবিড় হয়ে উঠার আগেই নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়। বরং সে বোন মাধুরীর সঙ্গে প্রকৃতির নানা দৃশ্যকে অনুভব করে —

> "দু-এক মিনিট চুপ থেকে সত্যব্রত বললে 'কি দেখছ মাধুরী কার্ত্তিকের কুয়াশার ঐ মাঠটা? ন্যাড়া কাঁটাগাছগুলো, শুকনো মাকাললতা, বঁইচি।'
>
> .....
>
> সত্যব্রত বললে, 'কার্ত্তিকে সন্ধ্যাটা কি আচমকাই এসে পড়ল একেবারে, কার্ত্তিক মাসটাই। এই বছরটাই। আমি এখনো গেলো বছরের ভিতর আছি, কিংবা তারও আগেও, তারও আগে। এমনিই বসতাম অঘ্রাণের সন্ধ্যায় এইখানে এমনি আউশের খেত কুয়াশা, দূরে ষ্টেশনের আলো, এঞ্জিনের শান্টিং এক একটা মালগাড়ির সে কি বেদম হাঁসফাঁস। তারপর সমস্ত শীত, শান্ত, তোমার পঞ্জিকার চেনা তারাগুলো নয়, কিন্তু আমারই জ্যোতিষ ও কবিতায় — আমিও কবি নয় কি মাধুরী? গোছগাছাল শীতল নিবিড় নক্ষত্রগুলো এমনিই ত ছিল সব।
>
> জীবনে তখন এক অপব্যয়ের সময় ছিল। অপব্যয় করে এত আরাম ছিল। যেন ঢের ভবিষ্যতের ডিম প্রসবের স্বপ্ন নিয়ে পাখির চোখে ঘুম এসে জড় হয়েছে, সাধ এসে, সাধ, ঘুম, নক্ষত্র, কুয়াশা, হেমন্ত। সমস্ত তার কোথায় চলে গেল?"[১]

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.-৮৯

'প্রেমিক স্বামী' গল্পে লেখক জীবনানন্দ বলেছেন, শীতের রাতের মধ্যে একটা পরম পরিতৃপ্তি রয়েছে। প্রভাত তার নিজের জীবনের অকর্মন্যতাকে শীতাক্ত বলে উল্লেখ করেছে। সারা দিনের অবসন্নতার পর মলিনা শীতের গভীরতার ভিতর স্বামীকে ভালোবাসতে পারেনা। প্রভাত ভাবে —

> "মনে হল, কেউ নেই, কোনোদিন কেউ ছিল না, কোনো মলিনা তার জীবনের ভিতর প্রবেশ করেনি যেন কখনো, কোনোদিন বেরিয়ে যায়নি। সন্ধ্যায় নদীর মুখটা এমন শান্ত, শীত, চারদিকটা এমন বিমুক্ত, জীবনে যেন এই সবের একটা গভীর উপশম এসে পড়েছে এখন। সকলেরই যেন মঙ্গল হল, সকলেই তৃপ্ত হল যেন, সকলেই শান্তি পেল।"[১]

'পাতা-তরঙ্গের বাজনা' গল্পে শীতের প্রসঙ্গে রয়েছে। সকালবেলায় প্রথম শীতের মিঠে রোদ মালতীর শরীরের কামনার কোন উদ্রেক করতে পাররেনি। মালতীর সঙ্গে দেবেনের অঙ্গাঙ্গী ভাব কোন দিনের জন্যই নেই। তাই কুড়িবছর বিবর্ণ দাম্পত্য জীবন বহন করার পর দাম্পত্য অভিজ্ঞতাকে সে শেষ করে ফেলতে চায়, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা - এসময়ের মধ্যে কদর্য লালসার বশবর্তী হয়ে পড়ে। কুড়ি বছর মালতীর স্বামী ছিল দেবেন, এমনি করেই জীবনের শীতগুলো কেটেছে। আর প্রকৃতিতে —

> "মাঘের শেষ দিনগুলো চলেছে। তবুও মাঝে মাঝে বসন্তের বাতাস দিতেছে। একদিন ভোরের বেলা জানলার কাছে বসে দেবেন তাকিয়ে দেখল গাছের সেই ডালাপালার হাড়গোড় সব ভরে উঠেছে। দু-চারটা গাছে হাড়গোড় যেন কোনদিন ছিল না, নতুন বছরের প্রথম পাতাগুলো ভোরের রোদে ছেলেদের সবুজ ঘুড়ির মত যেন হাড়কালো ডালাপালাগুলোকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ফূর্তি করতে বলছে। গুরগুর করে সমস্ত সকাল সমস্ত দুপুর এই পাতাগুলো পাতা-তরঙ্গের বাজনা বাজিয়ে চলেছে — বা।"[২]

শীত শেষ হয়েছে। বসন্তে শরীর ও হৃদয়কে বেশ ভালোলাগে নিখিলের। অমিতা নিখিলকে বা নিখিল অমিতাকে — কেউ কাউকেই কোনদিন ভালোবাসেনি। অমিতা প্রকৃতির বুকে যা দেখে, নিখিলকে যতটা বোঝে তাই ভালো লাগে তার। তার নানা রকম ছবি আঁকতে ভালো লাগে। কাজের ভিতরে বেশি সুখ পায় অমিতা। চাটগাঁয়ের আকাশ, পাহাড়, নদী, সমুদ্র, বন সবই সুন্দর লাগে অমিতার। প্রকৃতির ছবি আঁকে সে। সে নিখিলকে বলে —

> "কাল রাতে দেখলাম ঝাউগাছের পিছনে চাঁদ। জানলার কাছে অনেকক্ষণ বসে রইলাম, জ্যোৎস্নায়, বসন্তের হাওয়া দিচ্ছিল নিখিল। সেই যে আমাদের ছোট বেলার মাঠঘাটে যে বাতাস, ঠিক তেমনই যেন, তুমি বুঝতে যদি নিখিল, ঢের পুরনো কথা মনে হল— বলতে বলতে অমিতার চোখ জলে ভিজে উঠল।"[৩]

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.-১০৯
২। তদেব;পৃ. - ১১৪
৩। তদেব;পৃ. - ১২৯

'মহিষের সিং' গল্পের শোভনাদের বাংলোর চারিদিকে সবুজ মাঠের প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা করাই লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। প্রকাণ্ড সবুজ মাঠটি যেন নীল আকাশের নীচে গিয়ে মিশেছে। মাঠে বাংলোয় নির্জনতা ছড়িয়ে রয়েছে। এ প্রকৃতির দৃশ্য দেখে মানুষের হৃদয়, চোখ নরম হয়ে ওঠে। চারু, রঞ্জিত, শোভনা, রাণী — এদের জীবনগুলি প্রাকৃতিক দৃশ্যের মতো প্রস্ফুটিত হতে পারত, যদি এদের ভালবাসার ভিতর বীজ ও ফসল সহজ হয়ে উঠতো।

বৃষ্টি মুখর পরিবেশে লেখা 'বিস্ময়' গল্পটি। সুবোধ তার জীবনের পথ চলতে চলতে স্তব্ধ ও বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। এ গল্পের তারাপদর স্ত্রী সতী। সে আর্টকে ভালোবাসে। সিনেমা, থিয়েটারের চেয়ে, অবসর সময়ে কল্পনা, প্রকৃতির সৌন্দর্য সতীর কাছে অনেক বেশি প্রিয়। সুবোধ উপন্যাস লেখে। সুবোধও আর্টিস্ট। সুবোধ সতীকে ভালোবাসে। লেখকের তথা সুবোধের মনে প্রশ্ন জেগেছে, - "তারপর এই কোলাহাল ভিড় শীত ধোঁয়া অন্ধকারের ভিতর কেউ যেন বুঝতে পারে না পৃথিবীতে কে বাস্তবিক কার।"[১] কারণ বসন্তের আস্বাদের ভিতর সুবোধ যখন নতুন জীবনের ভালোবাসাকে অনুভব করেছে, মনে হয়েছে পৃথিবী এমন সুন্দর, হৃদয়ের এত সান্ত্বনা, মানুষের জীবনে এমন নিবিড় প্রেম আসতে পারে, ঠিক তার পরের সময়েই সুবোধ পেয়েছে কঠিন আঘাত। সতী মরে গেছে। তাই সুবোধের মধ্যে দেখা গেছে নিষ্ফলতা —

> "কেমন একটা নিষ্ফলতা তাকে পেয়ে বসেছিল। আর্টিস্টের নিষ্ফলতাই নয়, আরো কিছু। কিন্তু সে নিষ্ফলতা দু-মুহূর্তের জন্য শুধু। একটা নিবিড় ঘুম এলে তাকে ঘিরে ফেলতে লাগল যেন, খুব ব্যস্ততার সঙ্গে নয়, আস্তে আস্তে জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে এই প্রতীক্ষাকে এতে নরম বোধ হতে লাগল সুবোধের। নিষ্ফলতা ঘুমের ভেতর শূন্য হয়ে গেছে।"[২]

জীবনানন্দের প্রায় গল্পগুলিতে সঙ্গ-নিঃসঙ্গতা, ব্যথা-ব্যথাভরা আনন্দ, নির্জনতা-নীরবতা-একাকীত্ব ভিড় করে এসেছে। আর এসব এসেছে প্রায় গভীর শীত রাতের শুষ্কতার মধ্যে। তবে 'অশ্বত্থের ডালে' নামক গল্পটিতে জীবনানন্দ শীত রাত্রিকে এক অজানা অলৌকিক রহস্যময় আনন্দে মাতিয়ে তুললেন। এখানে কোন কাম-কামনা নেই। আছে নির্মল জ্যোৎস্নায় পেঁচার ডাকের অন্তরঙ্গ বার্তা - যা এ গল্পের বৃদ্ধ বংশলোচন বুঝতে পেরেছে। এ গল্পের নায়ক নির্মল চরিত্রটি জীবনানন্দের অন্যান্য নায়কদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সে বিবাহিত কিন্তু শীতরাত্রিতে নিজেকে অবিবাহিত এবং একাকী মানুষ ভাবতে ভালোবাসে। পাড়াগাঁয়ে থাকতে ছোট ছোট মাঠ, গাছের ডালপালা, জ্যোৎস্না ধানখেত দেখতে ভালোবাসে। তার কথায় —

> "এক মাস দুমাস হল ধান কাটা হয়ে গেছে। মাঠে মাঠে খড় পড়ে আছে শুধু। ..... মাঠগুলোর গায় পেয়ারা গাছের ডালপালা আর জ্যোৎস্না, শীতের রাত্রে এ এক গভীর আকর্ষণের জিনিস আমার। তাকিয়ে তাকিয়ে এর সৌন্দর্য আমি শেষ করতে পারি না।"[৩]

'ধান কাটা হয়ে গেছে' কবিতার সঙ্গে নির্মলের ভাবনার মিল দেখা যায়। জীবনানন্দ লিখেছেন —

> "ধান কাটা হয়ে গেছে কবে যেন

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.-১৪২

২। তদেব;পৃ. - ১৪৪

৩। তদেব;পৃ. - ৪১১

৪। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত;কবিতা সমগ্র-জীবনানন্দ দাশ / অবসর প্রকাশনা;ঢাকা - ১১০০/তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০০৫/পৃ.-২৩

ক্ষেতে মাঠে পড়ে আছে খড়-পাতা-কুটো-ভাঙা-ডিম
সাপের খোলস -নীড়-শীত।"[৪]

লেখক জীবনানন্দ এ গল্পে শীত রাতে এক পেঁচার অলৌকিক কাহিনী লিখেছেন। নির্মল এই শীতরাতে মজুমদারদের উঠানের জামরুল গাছ থেকে লক্ষ্মী পেঁচার ডাক শুনে বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। মজুমদারের বারান্দায় বসে থাকা বংশলোচন, নির্মলকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায়-সে কেন বাইরে বেরিয়ে এসেছে। উত্তরে নির্মল পেঁচার ডাকের কথা বলে। এরপর নির্মল ও বংশলোচনের কথোপকথন —

"বউটাকে মিছিমিছি কষ্ট দাও কেন?
সে আবার কি কষ্ট পাচ্ছে?
ট্যাকটেকে বউ কষ্ট পায় না? এই শীতের রাতে সোয়ামী বেরিয়ে
গেলে?"[১]

পেঁচার ডাকার গল্প বুড়ো বংশলোচনও জানে। কারণ সে বার বছর ঘুমোতে পারেনি। বংশলোচন জানায় মজুমদার নাকি তার গিন্নীর মৃত্যুর ছ-মাস পরে মারা যান। গিন্নী ছ-মাস আগে মরে এই অশ্বত্থের ডালে পেচকী হয়ে বসেছিল। সে কারণে মজুমদার মশায় আর মানুষের শরীর ধরতে চাইলে না। হয়ে গেলেন পেঁচা। না হলে গিন্নীকে হারাতে হতো যে। নির্মল বলে — "লোকটা এমনিভাবে শীতের রাত জমাতে পারে।"[২]

সমালোক জীবনানন্দের অনুপম বাচনের রীতি সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করে দিয়েছেন। করুণাসিন্ধু দাসের মতে— "কবিতায়, গল্পে-উপন্যাসে, প্রবন্ধে জীবনানন্দের নিজস্ব বাগভঙ্গি তাঁর মনীষার উজ্জ্বল স্বাক্ষর হয়ে আছে। স্বভাব কবির সহজ স্বচ্ছন্দ উচ্চারণ-জনিত স্বভাবোক্তি তার মাপকাঠি হতে পারে না। পরিপার্শ্ব সচেতন মননদীপ্ত ভাবনাযোগের প্রতীক হিসেবে figurative speech অর্থাৎ বক্রোক্তি হয়ে ওঠাই তাঁর সাহিত্যভাষার রীতি - সিদ্ধ পরিণতি। প্রচীন সাহিত্য সাহিত্যতত্ত্বের পরিভাষায় একেই বৈদগ্ধ্যভঙ্গি ভনিতি বলা হত। কোথাও কথ্য ভাষা, লেখ্য ভাষার চারু সন্নিবেশে, কোথাও আঞ্চলিক শব্দ-সংস্থাপন করে, কিংবা বিশেষণ-বিশেষ্যের অপ্রথাসিদ্ধ সাহচর্য নির্মানে, শব্দ-শব্দাংশ-ধ্বনির পৌনঃপুনিক আবর্তন - বিবর্তনে, স্থান-কাল-পাত্র ভূগোল-ইতিহাসের নামাবলী সাজিয়ে, চেনা-অচেনার সুষম বিষম তুলনায় উপমা-রূপক-অতিশয়োক্তি-উৎপ্রেক্ষা-সমাসোক্তির কারুকৃতি হাজির করে যুক্তি, জিজ্ঞাসা, অনুভব, অনুধাবনের সার্থক বাকপ্রতিমা গড়ে তুলেছেন জীবনানন্দ। অথচ কোথাও তাতে কৃত্রিম 'বাক-চাল' এর নীরস স্তূপ হওয়ার পরিস্থিতি আসেনি।"[৩]

'আস্বাদের জন্ম' গল্পটি হেমন্ত ঋতুর পটভূমিতে লেখা। এগল্পের বিভা বধূ নয়, মা নয়, সে আজন্ম কন্যা। সে মনে করে দ্বিতীয় বার সোমনাথের পরিবারে কন্যারূপে এসেছে। তার ওপরে কারু কোনো লালনের ভার নেই, সে নিজেই তাদের দ্বারা ললিত হয়ে উঠবে। সোমনাথের ও তার মা বাড়ির স্তম্ভ হয়ে থাকবে। রূপের জন্যই বিভাকে বিয়ে করেছিল সোমনাথ। সোমনাথকে পিতার মতো মনে করে বিভা। শুধু হৃদয়ের আবেগের মুহূর্তে বিভা মনে করেছে রক্তমাংসের পুরুষ মানুষ। লেখক বলেছেন, —

"এ সংসারের ভিতর সমস্ত সংকল্প কর্তব্য আশার পরিধি চিরকাল তৈরি
করে এসেছেন যিনি, আজ যেন হৈমন্তিক শিশির এসে গিলে ফেলেছে
তাঁকে।"[৪]

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.-৪১৩
২। তদেব;পৃ. - ৪১৫
৩। করুনাসিন্ধু দাস;আলোকের মহাজিজ্ঞাসায় কবি জীবনানন্দ/ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ কলকাতা - ৭৩/প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী, ২০০০, পৃ. - ১০৫
৪। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.-৭৮৮

মানুষের মনের মেজাজকে গল্পকার জীবনানন্দ ঋতুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। লেখকের কথায় বিভা হৈমন্তিক শিশির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। —

> "এই অসচ্ছল পরিবারের এই বরং, কঠিন চেহারার মেয়েটির টুকরো প্রশ্ন সোমনাথের মনের ভিতর শীত নদীর জলের আঘাতের মতো আঁচড় কেটে চলছিল।"[১]

সোমনাথের বাবা হেমন্তের সন্ধ্যায় চোখ বুজে স্থির হয়ে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকেন। সুপুরির গাছ, খেজুরের গাছ, আকাশের গায়ে কেমন ঘন সাদা সাদা মেঘ, সোনালি নারকেল ফল এসব দেখেন তিনি। কান পেতে শোনেন শিশিরের শব্দ। চারদিককার অন্ধকার বিমূঢ়তার ভিতর অভিমানী সোমনাথ জীবন কাটায়। মাকে তার কেমন রহস্য কুয়াশাময় মনে হয়। সোমনাথের মন মেঘের মতো ভেসে বেড়ায়। সেভাবে — "কারু শিষ্য হবার যোগ্য নই আমি। মনে আমার আবেগ আছে বটে কিন্তু তা আকাশকেও আঘাত করতে পারে না, মৃত্তিকাকেও না। মেঘের তরঙ্গ ও মাটির তরঙ্গ দুই-ই সুন্দর জিনিস পিসিমা, কিন্তু আমার জীবনটা কুয়াশার মতো হিম, আকৃতিহীন। আমি মৃত সন্তানের বাবা।"[২]

সোমনাথ মনে করে শক্তির জোরেই মানুষ মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আকাশ নক্ষত্র স্পর্শ করে। অকালমৃত্যু মানুষকে বেশি ব্যথা দেয়। বিভা মৃত সন্তান প্রসব করে সোমনাথ দেখে, মৃত সন্তান প্রসব করে বিভার হৃদয় ভেঙ্গে গেছে। সোমনাথ আরও লক্ষ্য করেছে, যে বিভা জীবিত সন্তান প্রসব না করলেও তাদের বাড়ীর কুকুরটা এই অঘ্রাণেই সন্তান প্রসব করবে। হতাশ সোমনাথ হেমন্তের রাতে নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে এই আশ্চর্য আস্বাদ অনুভব করে।

'এক সেতুর ভিতর দিয়ে' — গল্পে লেখক জানিয়েছেন, দেশে শীত পড়েছে। আবার কার্ত্তিক থেকেই বেশ শীত পড়েছে। সমরেশ মাঠের পথে বেরিয়ে আসে। সমরেশ গায়ে গরম কোট, গলায় কমফর্টার জড়িয়েছে। সমরেশ মফস্বলের একটা স্কুলের হেড মাস্টার। সে একজন স্থির, ধার্মিক ও যুবাপুরুষের মতো - যদিও বয়স বার্ধক্যের দিকে পা বাড়িয়েছে। লেখকের কথায় সমরেশ এখন পৃথিবীর রৌদ্র ও হিমের থেকে গা বাঁচিয়ে মাস্টারি কাজে নিযুক্ত হয়েছে। ঘর ছেড়ে নড়তে ইচ্ছে করে না তার। পারপার্শ্বিকের ভিতর স্থির থাকে। কখনও বসে থাকে, পায়চারি করে। বিকেলের রোদে শালিখদের উড়ে যেতে দেখে। দেখে, দেশের নদীর পাশে প্রচুর ধানক্ষেত, তার দিনের পরদিন হলুদে পরিণতি। আর দেখে —

> "এই শোভার দিকে তাকিয়ে থাকি অনেকক্ষণ - তাকিয়ে থাকি নদীটার দিকে। চারদিককার সন্ধ্যার আবরণ, ধূসর পেঁচার ওড়াওড়ি, হেমন্তের নরম গন্ধ প্রাণের ভিতর একটা শান্তি আনে।"[৩]

সমরেশ নারীর মুখের গড়নকে, নারীর অবয়বকে ভাস্কর্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে। সে জানে জীবনের স্বাভাবিক প্রবহমান লালসা নারীকে ঘিরে তৈরি হয়। তার মনের ভিতরে এক আন্দোলন তৈরি হয়। একদিন সমরেশের — "নক্ষত্রকামনা চূর্ণ হয়ে গেল। স্পর্ধা আগুন হয়ে উঠল তার। হেমন্তের ঝড়ে একটা বিরাট বৃক্ষের অসংখ্য বীজের মতো শরীর টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়তে লাগল তার। অসহ্য আনন্দের আরামের

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.-৭৯০

২। তদেব;পৃ. - ৭৯৩

৩। তদেব;পৃ. - ৮০৮

৪। তদেব;পৃ. - ৮০৯

অতলে মৃত্যু ও জীবন একাকার হয়ে গেল তার। বাঁকা চাঁদের শিঙের মতন অস্তমিত সূর্যের পিছনে ধাবিত হয়ে ছুটতে লাগল যেন। ..... এই হিমরাতের অন্ধকার অসীম হয়ে বেঁচে থাকুক — ঘুমের ভিতর দিয়ে আমি এক সেতুর ভিতর দিয়ে ওপারে চলে যাই — যেখানে ঘুম ভাঙে না, কোনোদিনও ভাঙেনা।"[৪]

'কুড়ি বছর পর ফিরে এসে' গল্পের নায়ক সোমনাথ। সে স্থির প্রবৃত্তির ঘনীভূত একজন সাধু মানুষ। নারী, আকাশ, বাতাস, দেবতা কোন কিছুই তাকে স্খলিত করতে পারে না। হেমন্ত রাত্রির সুস্থিরতার মতো সোমনাথের মন। আকাঙ্খার কুয়াশা তার মনের ধারে পাশে টিকতে পারে না। চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে কোন স্ত্রীলোক তার সম্পর্কে আসতে পারেনি। তবু সে জীবনটাকে আস্বাদ করতে পেরেছে। কার্তিকের বাতাবি লেবুর শরবৎ তার ভালোলাগে। গল্পের লেখক কার্তিক অঘ্রাণ পৌষ মাঘ ফাল্গুন এসব মাসে সোমনাথের কি ভালো লাগে তার উল্লেখ করেছেন। শীতের মিঠে রোদে বসে লেখাপড়ার দারুণ অভিজ্ঞতার কথা রয়েছে এখানে। সোমনাথ মনে করে - "এই পৃথিবীতে খুব আস্বাদ ও পিপাসা রয়েছে খরচ হয়ে যাবে সব, তারপর এই পৃথিবীর দেশে কিছুই থাকবে না আর, কার্তিক রাতের শীত ও নিঃশব্দতা ছাড়া।"[১] সোমনাথ দেখেছে কমলার হাসির আবেগের ভিতর কোথায় যেন একটা নিস্পন্দ মস্তবড় দেয়াল রয়েছে। এই হাসির আঘাত খেয়ে ভাদ্রের শীতে শেফালি ফুল শবের মতো রূপ ধারণ করে। সোমনাথ আরও দেখেছে শীতরাতে মাঠে মাঠে ঘাস ফলে ওঠে, আকাশে নক্ষত্র জ্বলে ওঠে। পূর্বপুরুষদের জিজ্ঞাসা নিয়ে সোমনাথ বাপের ভিটেতে পড়ে থাকে। আর অনুভব করে - "শীতের সুদীর্ঘ রাত, জোনাকি লক্ষ্মী পেঁচার ডাক, বাইরে তখন টুপ্ টুপ্ করে শিশির পড়ছে, জোনাকি উড়ছে, লক্ষ্মী পেঁচা ডাকছে এবং সঙ্গে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে তার বিছানার উপর। কিন্তু কমলার কথায় আলোড়িত হয় না আর সোমনাথের হৃদয়।

'বৃত্তের মতো' গল্পটির মধ্যে মৃত্যুচেতনা ও যৌনচেতনার প্রসঙ্গ রয়েছে। লেখক জীবনানন্দ অতিন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করেছেন, আকাশের নীল রৌদ্রের গন্ধে জীবনের অপরিসর স্মৃতিগুলো ভরে যায়। কখনো কখনো অঘ্রাণের বিবর্ণ পাণ্ডুলিপি আয়ুহীন নীরব তারা হয়ে উঠেছে, আবার কখনো নারী এসে উপস্থিত হয়েছে। যে নারীর মনের ভিতর কোনো মহান পাণ্ডুলিপি লুকিয়ে আছে, সেই নারী হল এ গল্পের নির্মলা। লেখকের বর্ণনায় নির্মলা —

> "নির্মলার মন নক্ষত্রের মতো। পৃথিবীর মানুষের মন মৃত্তিকার মতো। অথচ নির্মলার রূপ ভোরের শেফালিকা শিশুর মতো মোটেই নয়, তা যদি হত কোনো গভীর মানুষই সহ্য করত না তাকে। নির্মলার রূপ মলিন অঘ্রাণের গন্ধের মতো, সেজন্যই সে মানুষের বেদনার কারণ।"[২]

কুয়াশায় অনেক মানুষের জ্ঞান হারিয়ে যায়। গল্পটি শুরু হয়েছে সমরেশ ঘোষালের মৃত্যু দিয়ে। সমরেশের মৃত্যুর পর জীবনানন্দ পৃথিবীকে দেখেছেন অন্যরকম — "সমরেশের মৃত্যুর খবর পেলাম, সমরেশের মৃত্যুর সংবাদ আমাকেও যে পেতে হবে কোনোদিন মনে করিনি তা। কিন্তু তারই মৃত্যুর খবর আমিও পেলাম, তাকিয়ে দেখলাম পৃথিবী যেন নতুন জন্মদিনের আনন্দে লিপ্ত হয়ে রয়েছে। আকাশে অনেক রৌদ্র, নদীর জলে অনেকে তরবারি নিয়ে খেলা করছে। মাছরাঙা ঢেউয়ের ভিতর পাখনা ভিজিয়ে নিচ্ছে তার। কিছু তবুও আকাশ যেন আরো দূর আকাশের কিনারে একটা শান্ত অক্ষয়িতার ভিতর চুপ করে রয়েছে। চন্দন কাঠ ও ক্ষীরের গন্ধ - কোথা থেকে এল যে বুঝতে পারলাম না। যেন সেই নীরবতাকে

১। দেবেশ রায় সম্পাদিত : জীবনানন্দ সমগ্র শতবর্ষ সংস্করণ / গল্প - ২, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন, কলিকাতা - ১৩ / প্রথম প্রকাশ - ২০০২, পৃষ্ঠা - ৪৮৯

২। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.-৮২৭

৩। তদেব;পৃ. - ৮২২

মনোরম করে তুলেছে।"[৩] আসলে গল্পের কথক মৃত্যু চেতনাকে অতিক্রম করে প্রকৃতির রমনীয়তাকে উপভোগ করেছেন।

'ভালোবাসার সাধ' গল্পটিতে জীবনানন্দ এক মায়াবী পরিবেশ তৈরি করেছেন। পুরুষমানুষের বাড়ি, একজন স্ত্রীলোকও নেই, বৌঠান ও দশবছর হল মারা গেছে। নারী হীন বাড়ির মধ্যে তৈরি হয়েছে কার্তিকের হিম অন্ধকার, নীরব, বিষণ্ণ পরিবেশ। অন্ধকারের ভিতর কাকা ও বাবা দুজনের মুখ ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় ফুটে উঠে। এগল্পের নায়ক তার কাকা ও বাবার মুখ নিরীক্ষণ করেছে অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে। —

> "অন্ধকারের ভিতর অনুভব করলুম দুজনের মুখই কুঞ্চি ত হয়ে রয়েছে,
> একজন বেদনাময়, আরোকজন দ্বিধার বিভীষিকায়। অন্য মুখটির কথা
> খুঁটে নিলুম আমি। ব্যথিত কাকার মুখই অন্ধকারের ভিতর অনুভব
> করছিলুম আমি।"[১]

নায়কের মনের ভিতর কি একটা আস্বাদ জন্ম নিয়েছে। মুহূর্তে সে বেদনা অনুভব করে। কারণ, সে বুঝেছে তার কাকার কোন সাধ বা কামনা কোনভাবে কোনদিন পরিতৃপ্ত হয়নি। তার কাকা অনুতাপ করে। মানুষটির যেন বেদনার সীমা খুঁজে পাওয়া যায়না। এক শান্ত স্বাভাবিক মানব চরিত্র, নিঃসহায় জগতের লোক তার বাবা। কাকা, বাবার তার দিকে তাকিয়ে শুধু কল্পনার জাল তৈরি করে। কাকার ধোসাটা হিম মাটিতে লুটোপুটি খায়, আর কাকা আলুথালুভাবে নায়ককে জিজ্ঞাসা করে মেয়েটি সুশ্রী'তো। দেখতে বেশ সুস্থ তো। সর্বোপরি তার কাকা আশা করে —

> "মনে হল আমাদের সংসারে এই মেয়েটি এলে, একটু নতুনত্ব হবে,
> অনেকটা শান্তি পাব।"[২]

জীবনে এরা নারীর ভালোবাসার সাধ পায়নি। ঈর্ষা, স্বভাব, মৃতা এসবকে তারা সামলাতে পারে না কাজে। তবে একদিন এরা নারীর পাশে শুধু মায়া-মমতা নয়, লালসার আকাঙ্খাও করেছিল। নারীর শুশ্রূষাহীন, ভালোবাসাহীন জীবন যেন এদের কাছে কার্তিকের হিম অন্ধকারের মতো হয়ে উঠেছে।

১। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ঃ জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র/গতিধারা; ঢাকা - ১১০০/২১শে বইমেলা,২০০০/পৃ.-৮৩০
২। তদেব;পৃ. - ৮৩১

জীবনানন্দের গল্পে ঋতু, ঋতুবাচক মাস ও ঋতুবাচক সংকেতের উল্লেখ

গল্পের নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাস	ঋতুবাচক সংকেত
কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়	শীত		কুয়াশা, শীতের ক্ষেত, হিম।
মেয়ে মানুষদের ঘ্রাণে	শীত		নক্ষত্র নিস্তব্ধতা, টুপ্‌টাপ্‌ শিশির পড়ার শব্দ, খড় ঘাস সুতো কুটো আঁশের নিবিড় নিরালা বিছানা, রোদ ফসলের প্রকাণ্ড পৃথিবী, ডানার নিরীহ নিবিড় গরমের আরাম, কুয়াশা, শিশির।
মাংসের ক্লান্তি	হেমন্ত	অঘ্রাণ	কুয়াশা, হিম।
উপেক্ষার শীত	হেমন্ত		এক পশলা বৃষ্টি, অসাড়তা, প্রাণহীনতা, নিষ্ফলতার শীত, অবিশ্বাস, শীতলতা, শীতাক্ত প্রদেশের নিষ্ফলতায় অসাড়।
আকাঙ্খা-কামনার বিনাস			কুয়াশা, শীত, মৃত্যু।
বিবাহিত জীবন	শীত , শরৎ		শীতের সময় শরতের জ্যোৎস্না।
নকলের খেলায়	শীত	অঘ্রাণ	ঘুমের অনন্তস্ব, হিম অন্ধকার।
মা হবার কোনো সাধ	শীত		রক্তাক্ত শীতাক্ত।
শুধসাধ, শুধুরক্ত, শুধু ভালোবাসা	শীত হেমন্ত	আশ্বিন কার্তিক	মৃতজ্যোৎস্নার অন্ধকার, শেয়াকুল ও বেতঝাড়ের উপর কুয়াশা, শিশিরের পিছল ধানের শিসগুলোর উপর জ্যোৎস্নার ঝিক্‌মিক্‌, পেঁচার পাখা মেলে নিরুদ্দেশ যাত্রা, কুয়াশার ছবির ধারের ভিতর অন্ধকার স্তরের জীবন পুলকের দিন শেষ, আউশের ক্ষেতে কুয়াশা, ঘুম নক্ষত্র-কুয়াশা-হেমন্ত।
ছায়ানট			ঘরটা ঠাণ্ডা মেরে গেছে।
প্রেমিক স্বামী	শীত		শীতাক্ততার ভিতর প্রভাতের নিজের জীবনের অকর্মন্যতা, সন্ধ্যায় নদীর মুখটা শান্ত, শীত, চরিদিকটা বিমুক্ত।
পাতাতরঙ্গের বাজনা	শীত, বর্ষা, গ্রীষ্ম		মিঠে রোদ, গভীর অন্ধকারের ভিতর দেবেন নিজের ভীষণ কুৎসিত মুখ উপলব্ধি করে।
আর্টের অত্যাচার	শীত, বসন্ত		বিচ্ছেদ, মৃত্যু, অজস্র উৎশৃঙ্খল শব্দ জ্যোৎস্না।
মহিষের শিং			হলদে খড়, সোনালি খড়, বিষণ্ণতা, ঝাঁ ঝাঁ রোদ, জ্যোৎস্না রাত।
বিস্ময়	শীত, বসন্ত	বৈশাখ	কলকাতা শহরে বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে হাঁটা বন চালতার বীথি, ধানের সবুজ শরীর, ধানের সোনালিগুচ্ছের মাদকতাময় গন্ধ, জ্যোৎস্নায় বসন্তের হাওয়া, জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে সুবোধের প্রতীক্ষা, নিষ্ফলতা শূন্য ঘুমের ভিতর।
হাতের তাস		বৈশাখ	প্রমথের অসহ্যগরম, বৈশাখের নীল বাতাস, কৃষ্ণচূড়া গাছে ফুল, পানকৌড়ির ডাক, আউশ ধানের পোড়ো ক্ষেত

গল্পের নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাস	ঋতুবাচক সংকেত
কোনো গন্ধ		বৈশাখ	ছাতকুঁড়োর সাঁগাল গন্ধ।
বেশিবয়সের ভালোবাসা	শীত	চোত-বোশেখ	কলকাতার গরম, গরমের সময় শীত উপভোগ্য, বরফ আছে এমন কোন শীতাক্ত প্রদেশ।
বত্রিশ বছর পরে	শীত, বর্ষা		শীতে কাঁপে, বর্ষায় ভেজে।
তিমিরময়			ঠাণ্ডা পাহাড়ের জায়গা, অন্ধকারের অলসগন্ধ।
সাত কোশের পথ		বৈশাখ ৩র বৈশাখ ৪ঠা বৈশাখ ৫ই বৈশাখ ৬ই বৈশাখ ৭ই বৈশাখ ১৩ইবৈশাখ	অন্ধকার শিশির জোনাকি, পেঁচা কুমড়ো শশার লতা, নিস্তব্ধতা, দুপুরের অলস সময়, শীতবোধ। কমলা ফুলের মত মেঘ লক্ষ্মী পখির শিশিরাক্ত ডানা, ধানের সোনার শিষ।
চাকরি নেই		বৈশাখ	কাশের শিষ, গরমের দিন, কুয়াশা নেই, আকাশ গভীর নীল, রোদ উজ্জ্বল দুপুরের চড়া রোদ, বিরাট নক্ষত্রের রাত।
ক্ষণিকের মুক্তি দেয় ভরিয়া	হেমন্ত, শীত		
শেষ পছন্দের সময়		চৈত্র	হাল্কা ঠাণ্ডা হাওয়া, ঝিরঝিরে নদীর জলের ঘ্রান।
প্রণয় প্রেমের ভার		শ্রাবণ	বাইরে হিজিবিজি তারা, অপরূপ জ্যোৎস্না, মেঘ বিলাসী শ্রাবণের সবুজ ধানের মত সচ্ছল।
বাসর শয্যার পাশে	হেমন্ত, শীত, বর্ষা		ম্লান জ্যোৎস্না, কাটা তরমুজের ঘ্রাণ গরমের রাতে, শিশির ভেজা ফুলো ঘাসের সোঁদা গন্ধ।
সুখের শরীর			ধানের ফাঁকা ক্ষেত।
নষ্ট প্রেমের কথা	শীত	মাঘ মাঘ, ফাল্গুন	গভীরতর অন্ধকার, খড়, শান্ত ও নিস্পৃহ হৃদয়। জ্যোৎস্না, শাদা শাদা ফুল।
বাসররাত	বসন্ত	বৈশাখ	
প্রণয়-প্রণয়ী		বৈশাখ	ঝড়বৃষ্টির রাস্তা, ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত, পাকা খসছে, ডালপালার মো-মো শব্দ, ধুলো উড়া।
মেয়েমানুষের রক্তমাংস		বৈশাখ	কৃষ্ণচূড়া গাছের ফুলঝরা, মেঘের অন্ধকার, টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টি।
মেয়েমানুষ	শীত	মাঘ	
হিসেব-নিকেশ	শীত		পুঁই শাকের চচ্চড়ি।
একঘেঁয়ে জীবন	শরৎ, শীত	আশ্বিন, কার্ত্তিক	কার্তিক মাসের মেঝের ড্যাম্প, দোয়েলের ডাক,
কিন্নর লোক			বাতাস বেশ মধুর, নীল আকাশ সবুজ বকুল গাছ, ধানের খেত, কুয়াশা ঢাকা নদী।

গল্পের নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাস	ঋতুবাচক সংকেত
হৃদয়হীন গল্প			বাদল কেটে গেছে, আকাশের নীলিমা, আধো রোদ কমনীয় শিশির।
বিবাহ-অবিবাহ	শরৎ, শীত		পাতা হলুদ হচ্ছে, হেমন্তের অসাড়তা, স্পৃহমান গাছপালা পাতা ঘাস, মাঠের ঘাসে কাশের নিরবচ্ছিন্নতা, হেমন্তের হিম কুয়াশা, ধান জ্যোৎস্নায় লাবণ্য, শিশির ঝরার শব্দ।
হেমন্তের দিনুগলো	হেমন্ত হেমন্ত		মেঘে বাতাসে মর্মায়ত আনন্দপূর্ণ হেমন্তনারী, হেমন্ত লোক, হেমন্তের জলের, খড়খড়ে শুকনো পাতা রৌদ্র, ধুলায় চড়ে।
শীত রাতের অন্ধকারে	হেমন্ত শীত	অঘ্রাণ জ্যৈষ্ঠ	শিশিরের ভেজাপাতা নরম রোদ, পাতা ঝরছে, একটু-আধটু শিশির ঝরছে, ধানশস্য, চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম ঠাণ্ডা জ্যোৎস্নারাত, বাদুড় উড়ছে, লক্ষ্মী পেঁচা করমচা গাছে ডাকছে।
বাসনা কামনার গন্ধ	শীত		হিম, গলায় কমফরটার কড়াই শুঁটি ভাজা।
অঘ্রাণের শীত	হেমন্ত, শীত		
অশ্বত্থের ডালে	বসন্ত শীত	অঘ্রাণ, আশ্বিন, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ	শূন্য আর শুষ্কতা, সন্ধ্যা হয়, কুয়াশা নামে, অন্ধকার শীত, আকাশ ভরে নীহার স্রোত, হিম, ম্লান রোদ, সোনালি রোদ, কালবৈশাখী, উলের টুপি ভালো সর্ষেক্ষেত, অপরাজিতা ফুলে প্রজাপতি।
সমুদ্রের স্রোতের মতো	শীত		মাঠে মাঠে খড় পড়ে আছে, রাজ্যটা তখন পেঁচার বাদুড়ের জোনাকিদের, জ্যোৎস্নার অন্ধকারের নক্ষত্রের।
বিচ্ছেদের কথা	শীত	আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ	বিকেল বেলা নরম রোদ, কুয়াশা, শীতের হাওয়ায় ধূসর রোম শিরশির করে কাঁপে, ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া।
তাসের ছবি	বর্ষা	অঘ্রাণ	মাঠপ্রান্তরের হাড়ভাঙ্গা হাওয়ার ঝাপটা, কনকনে নদীর জল শিশিরে ফগ্‌ফগ্‌।
পালিয়ে যেতে		শ্রাবণ ফাল্গুন, বৈশাখ,	নীল-সাদা মেঘগুলো ঝাড়ুদার যেন গুছিয়ে রেখেছে, শ্রাবণের আকাশ মেঘে ভরে গেছে, চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে।
রক্তমাংসহীন	শীত	জ্যৈষ্ঠ মাঘ	আমের বোল, দুপুর ভরে ডালে শালিখগুলো কিচির-মিচির করত, নিস্তব্ধ দুপুর ঝিঁঝিঁ ডাকছিল।
জামরুলতলা		ফাল্গুন, আশ্বিন	
			পেয়ারা পাতার ওড়াউড়ি, দুপুরের বাতাস বড় উদাস, কৃষ্ণচূড়ার অজস্র কুঁড়ি জারুলের ঐশ্বর্য।

গল্পের নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাস	ঋতুবাচক সংকেত
লোভ		বৈশাখ	বৈশাখের নীল আকাশ, নারকেল গাছের সবুজ উজ্জ্বল পরিষ্কার পাতা, শঙ্খচিলের সুন্দর তির্যক পক্ষবিস্তার, মর্মাহত বটের উচ্ছ্বাস, দিনান্তের রৌদ্রের অপরূপ মাদকতা, বৈশাখের নির্মল দুপুর মাদকতা, বৈশাখের নির্মল দুপুর, ঝিলের থেকে জলপিপির স্নিগ্ধ সরস ডাক।
মানুষ-অমানুষ	বর্ষা		চরিত্রের নাম হেমন্ত, বৃষ্টি
কল্প জিনিসের জন্মও		বৈশাখ	
যৌবন			
ক্ষমা-অক্ষমার অতীত		চৈত্র, বৈশাখ	বড় বড় নিরেট হলদে ডুমুরের পাতা শুকনো পাটকিলে রঙের আমকুল, দুপুরের ছাতিফাটা রোদ, দুপুরবেলা অশথের ডালে কাকের ডাক, রৌদ্রের বুকের ভিতর মেঘ।
প্যাচা ও জোনাকিদের মধ্যে		বৈশাখ	
প্রণয়হীনতা	শীত	চৈত্র, ফাল্গুন	মেঘলা আকাশ, ঠাণ্ডা ঝির্‌ঝির্‌ হাওয়া, রোদ ও প্রান্তর ধক্‌ধক্‌ করছে, সবুজ ঘাস নেই, দয়া নেই, পাথরের চাঙড়, বাদল করে মিষ্টি ঠাণ্ডা পড়া, লুয়ের মতো গরম।
আকাঙ্ক্ষার জগৎ		বৈশাখ, মাঘ	সোনালি ডানা চিলের উড়ে বেড়ায়, দ্রোণফুল, নিস্তব্ধ অপরূপ দুপুর, শীত সন্ধ্যার কুয়াশা, পৃথিবীর রৌদ্র, অন্ধকার, কুয়াশা, বৃষ্টি, হিমের ভিতর।
মৃত্যুর গন্ধ		আশ্বিন	চরিত্রের নাম হেমন্ত, আকাশ কালো লোমের মতো থেকে ভরে যায়, ঝির্‌ঝির্‌ ঠাণ্ডা হাওয়া।
জীবনের অন্তঃপুর ও তেপান্তর	শীত		বাতাসের সুন্দরপ্রবাহ, সবুজ ঘাস, কাশ, ফিভা দোয়েল শ্যামাপোকা পানকৌড়ির ডানার গন্ধে ভরা, অন্ধকার ভিজে বাতাস, ইলশে-গুঁড়ির মতো হিম বৃষ্টি ঝরে, কুয়াশামাখা।
গ্রাম ও শহরের গল্প	শীত	আষাঢ়, কার্তিক	বৃষ্টি ধরেছে, পাড়াগাঁর কুয়াশা, ধানের ক্ষেত, পালংশাক কফি বীট-গাজর জিউলি হিজল বেঁটে খেজুর, শুপুরি কুঁড়ি ঝরার শব্দ, শীত রাতের ওপর বৃষ্টির কন্‌কনে হাওয়া, শীতে বৃষ্টিতে অন্ধকারে রোদে।
করুণার রূপ	হেমন্ত	আষাঢ়	কুয়াশায় কুয়াশায় দিনভর।
এক এক রকম পৃথিবী			অন্ধকারের আবহাওয়া বদলে যায়, পৃথিবীর রৌদ্রে রৌদ্রে অস্থির আষাঢ়ে চাঁদের আলোয় ঝিনুক কড়ি ফটিকের কুয়াশা সাপ।
বাইশ বছর আবার ছবি			দুরন্ত গরম, রাতে বেশ শীত, পর্বতের কুয়াশার ভিতর তৃপ্ত, তারা সোনালি বুদ্‌বুদের মতো, বাসমতী ধান।

গল্পের নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাস	ঋতুবাচক সংকেত
কবিতা আর কবিতা, তারপরেও আবার কবিতা			মেঘ, ঠাণ্ডা
কুড়ি বছর পরে			বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, দুধের ফেনার মতো নরম নির্জন দুপুরের বাতাস, বাবলা ফুলের গন্ধ, মেঘের ভেতর থেকে মাঝে মাঝে চাঁদের বেরিয়ে পড়া, বৃষ্টির জল নিঃশব্দে ঝরছে, বাইরে বৃষ্টির বান।
রক্তের ভিতর			কৃষ্ণচূড়া ফুল, প্রবহমান পাখির ডানার মতো চঞ্চল সোনালী রোদ আকাশে চিলের ওড়াওড়ি।
মনোবীজ	শীত	বৈশাখ	নির্জন মেঘের দুপুর।
কবিতা নিয়ে	শীত		শীতরাতের পেঁচা।
রক্তমাংসের স্পন্দন	শীত	বৈশাখ	
ধূসর পাণ্ডুলিপি	শীত		গরমে হাই-ফাই করছে শরীর, স্বপ্নচতুর মেঘ, কুয়াশার মিষ্টি চাদর একটু বৃষ্টি পড়লে ভালো হত।
পৃথিবীটা শিশুদের নয়	শীত	বৈশাখ	শীতের রাত শান্ত, সুন্দর, শীতের রাত স্তব্ধ ও সুন্দর।
করুণার পথ ধরে মায়াবী প্রাসাদ	শীত	কার্ত্তিক	সন্ধ্যা, শীত, নির্জনতার একটা আকৃতি ভয়াবহতা, সারারাত নির্জন গাছের থেকে শিশির ঝরছে, পেঁচার পাখার নিস্তব্ধ গন্ধ, চাঁদের ক্লান্ত হিমের ভিতর, নক্ষত্রের রূপালি আগুনে আকাশ ভরে রয়েছে, কার্তিকের প্রান্তরের ঘাসের মতো ধীরে ধীরে হলুদ।
অস্পষ্ট রহস্যময় সিঁড়ি	হেমন্ত,		অন্ধকার ও শীত, শান্ত সুন্দর কথা, মৃত্যুর কথা নয়, নিজের মাংসের শীত আস্বাদ।
সোনালি আভায়	শীত		পৃথিবীর কোমল নীল অন্ধকার মৃত তরমুজের আঘ্রাণ মৃত ঘাসের গন্ধ মৃতপাথর, শত কদমফুল, মৃত শিউলি পাতা।
বাসনার দেশ			সোনালি আভায় পৃথিবীর ঘাস নদী মানুষের মুখ রঙিন হয়ে উঠেছে।
সাধারণ মানুষ	শীত		চিরন্তন নক্ষত্র শিশিরের জল, নীড় ভেজা, হিম কার্তিকের অন্ধকার।
আস্বাদের জন্ম	হেমন্ত	কার্ত্তিক	চারদিকে শিশির, চারদিকে শূন্যতা, একখণ্ড ঘাসের নির্জন শিস।
এক সেতুর ভিতর দিয়ে	বর্ষা, শীত হেমন্ত		হৈমন্তিক শিশির, মেঘ কেমন ঘন সাদা, হলুজ কাঁঠালপাতা উড়ে এসেছে, কান পাতলে শিশিরের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, হিম আকাশ।
কুড়ি বছর পর ফিরে এসে		অঘ্রাণ	কুয়াশা, বাতাবি লেবু, শীতের সুদীর্ঘরাত, জোনাকি লক্ষ্মী পেঁচার ডাক, টুপ্ টুপ্ শিশির পড়ছে।

গল্পের নাম	ঋতুর নাম	ঋতুবাচক মাস	ঋতুবাচক সংকেত
ওর মতো	হেমন্ত	অঘ্রাণ	আকাশে অনেক রৌদ্র, জ্ঞান, হেমন্তের বিকেলের বুকের মতন কুয়াশায় হারিয়ে যায়, কুয়াশা, নীল রৌদ্রের গন্ধ।
ভালোবাসার সাধ		কার্ত্তিক	হিম অন্ধকার, নীরব, বিষণ্ণ।
বিলাস	শীত		দিনের বেলা কম রোদ, রাত খুব প্রখরভাবে ঠাণ্ডা, কুকঁড়ে সুঁকড়ে লেপ জড়ানো।
অনেক রাতে হুমায়ুন প্লেসের থেকে			লতাগাছের শক্ত জটা আঁকড়ে ধরে অজস্র লতাপাতা ফুল ও বৃষ্টির জল, শিশিরের শব্দের মত সুর।
বিন্দুবাসিনী			ভোরবেলা, দুপুরে, সন্ধ্যায় ভিজে ভিজে শীতের বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে জড়সড় হওয়া।
সোমনাথ ও শ্রীমতী	হেমন্ত		রোদ বাতাস নীল জলরাশি হৈমন্তী ধান-বাসমতী রূপশালি গোবিন্দ ভোগ।